সবার সেরা ভূত পেত্নী আর মজা

সম্পাদনায়—শানু ঘোষাল

প্রমীলা প্রকাশনী
পরিবেশনায়—দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

SABAR SERA BHOOT
PETNI AR MOZA.
A Collection of short stories of prominent.
Bengali Writers, Editied by Shanu Ghoshal,

প্রকাশ : ১৩৫৭

প্রকাশ করেছেন :
প্রমীলা প্রকাশনী
রুরু ঘোষাল, কলিকাতা-৫১

মলাটের ছবি :—পিণাকী চন্দ্র

ভেতরের ছবি :—দীপংকর কুমার সরকার ও কামদেব সরকার

ব্লক :—বেংগল ব্লক, ৩২৭এ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৯

ব্লক ছেপেছেন :—আর্ট এণ্ড কোং, ৩২৭এ রবীন্দ্র সরণী, কলি-৯

ছেপেছেন :—নিউ কমলা প্রেস, ৫৭।২, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯,

দাম :—টাঃ ৭'৫০

উপহার

উৎসর্গ

স্বেতঃ লাল বেহারী-দের শম্ভুর মা-কে যাঁর অমর আত্মা আমাদের মা-ঠাকুমাদের গল্প বলতে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করে, সেই

—শম্ভুর মাকে

প্রমীলা প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

ছোটদের	
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের গল্প (যন্ত্রস্থ)	(সংকলন গ্রন্থ)
সবার সেরা ভূত পেত্নী আর মজা	(ঐ)
হিমালয়ের চোখ জলে (২য় সংস্করণ)	শনু ঘোষাল
ছোটদের ট্রডের রাজস্থান কাহিনী	(সংকলন গ্রন্থ)
মোগল হারেমে শেষ রাত্রি	শনু ঘোষাল
শতবর্ষের লেখিকার গল্প	(সংকলন গ্রন্থ)
বেকারদের শূকর পালন	ডাঃ এ. কে. ঘোষাল ও ডাঃ সি. আর. বিশ্বাস
মালতী সন্ধ্যা	শনু ঘোষাল

ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসীর কাহিনী

—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

বেতাল কহিল, মহারাজ,

ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে এক জন ভোজনবিলাসী; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী; অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন্ বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞানুসারে সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল; এবং আসনে উপবেশন মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, না মহারাজ, আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন! সে কহিল, মহারাজ, অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে; বোধকরি, শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া, তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন; এবং, এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।

তদনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ, ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে; তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্বক, অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষপ্রদর্শন পূর্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিকপ্রদান পূর্ব্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ, উভয়ের মধ্যে কোন্ জন অধিক প্রশংসনীয়। রাজা কহিলেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

"ভেকধারী বৈষ্ণব"

—মধুসূদন দত্ত

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হোঁ, ভাল হয়েছে, এই একটা মুস্কিল আসান আস্‌চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখছি; এখানে চুপ করে দাঁড়য়ে থাকলে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।)

(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ।)

সার। হাল্লো! চওকীডার! এক আডমী ওঢার ডৌড়কে গিয়া নেই?

চৌকি। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্‌ডী ডণ্ড়কে যাও, উষ্টরফ ডেকো, যাও—যাও—জল্‌ডী যাও, ইউ স্যুওর।

চৌকি। (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইওর আইজ—ইচার, ইউ ফুল।

চৌকি। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। (বেগে প্রস্থান।)

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন্ ক্যেচ হিম—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো—উহুহুহুহু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া।

নেপথ্যে। উহুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ।)

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্টা হেয় ?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—

সার। হেং ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে,—চুপরাও, ইউ ব্লডী নিগর্, ডেকলাও টোমারা ব্যেগমে কিয়া হেয়। (বলপূর্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া—রাঢে, কিস্ ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত।)

চৌকি। খাড়া রও,—।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানি—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্‌ব্রূট্। ইয়েহ্ ব্যেগমে আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপূর্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্‌স্ রাইট্! ইউ স্টুপিড ডেভল্। কেস্কা চোরি কিয়া ? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

মজার মজার কথা চাই। তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, "নয়ান! আজকাল তোমার কিছু সুখ সওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আর তোমার সে সোলা নাই। এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হলেই আর তোমার চা'ট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ নাকি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য হে। ব্যাপারখানা কি বল দেখি নয়ান! গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান! কিসে তোমার কপাল ফিরল, তা বল।'

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে, বাজখাঁই-স্বরে বলিলেন—"আড্ডাধারী মহাশয়! ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন,—"ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট্ করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"চট কেন ছাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয় তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তার চেয়ে না বলা ভাল। আজকাল আমার হইল ধর্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয়? তোমাদের মতি-গতি অন্যরূপ। কিসে আমার দু পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না। আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।"

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কিসে নয়নের

পয়সা হইল এ কথাটি শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,—"আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক,শাক্ত,কৃষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,—আর কি নাম করিতে বাকী রহিল, আড্ডাধারী মহাশয় ?"

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আর কি বাকী আছে ? বাকী আর কিছুই নাই। সেই যে ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়াছিলেন,—'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা। যদি সতেরো পর্য্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকী কি রাখিলি ?' ছেলেরা কেবল সতর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল ; তা নয়ান, তুমি সতরো ছাড়িয়া উনিশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছ। বাকী আর কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রাহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতেরো, আঠারোর মানে কি ?

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া খেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছুঁড়িয়া সেই ব্রাহ্মণদেবতা ছেলেদের মারিতেন। এক দিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মত চক্ষু করিয়া মাঝে তিনি কট্‌মট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ। বড়ই বিপদ!

আঠার না বলিলেও নয়, ও-দিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্ম্মা মূর্ত্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক জন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'ভাই! এ পুকুরপাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে? এই কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুনিতে আরম্ভ করিল—এক, দুই, ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮ ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।—এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতরো বলিল, আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—'তবে রে আঁটকুড়োর বেটারা! আর বাকী রইলো কি? যদি সতরো পর্য্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারো বাকী রাখিলি কি?" এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যে দিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে কৃষ্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে, মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্য্যন্ত বলিলে। বাকী আর কি রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ, বিশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।"

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন,—"না, না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি, যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।"

সাত ভাই চম্পা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক রাজার সাত রাণী। দেমাকে, বড়রাণীদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরাণী খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটরাণীকে সকলের চাইতে বেশি ভালবাসিতেন।

কিন্তু, অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড় রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে,—ছোটরাণীর ছেলে হইবে। রাজার মনে আনন্দ ধরে না; পাইক-পিয়াদা ডাকিয়া, রাজা, রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন,—রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, মিঠাইমণ্ডা মণি-মাণিক যে যত পার, আসিয়া নিয়া যাও।

বড়রাণীরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল।

রাজা আপনার কোমরে, ছোটরাণীর কোমরে, এক সোনার শিকল বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—"যখন ছেলে হইবে, এই শিকলে নাড়া দিও, আমি আসিয়া ছেলে দেখিব!" বলিয়া, রাজা, রাজ-দরবারে গেলেন।

ছোটরাণীর ছেলে হইবে, আঁতুড়ঘরে কে যাইবে? বড়রাণীরা বলিলেন,—"আহা, ছোটরাণীর ছেলে হইবে, তা অন্য লোক দিব কেন? আমরাই যাইব।

বড়রাণীরা আঁতুড়ঘরে গিয়াই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভাঙ্গিয়া, ঢাক-ঢোলে বাদ্য দিয়া, মণি-মাণিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে, রাজা আসিয়া দেখেন,—কিছুই না!

রাজা ফিরিয়া গেলেন।

রাজা সভায় বসিতে-না-বসিতেই আবার শিকলে নাড়া পড়িল।

রাজা আবার ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন, এবারও কিছুই না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করিয়া বলিলেন,—"ছেলে না হইতে আবার শিকল নাড়া দিলে, আমি সব রাণীকে কাটিয়া ফেলিব।" বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন।

একে একে ছোটরাণীর সাতটি ছেলে একটি মেয়ে হইল। আহা, ছেলে-মেয়েগুলি যে—চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করিয়া হাত নাড়ে, পা নাড়ে,—আঁতুড়ঘর আলো হইয়া গেল।

ছোটরাণী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"দিদি, কি ছেলে হইল একবার দেখাইলি না!"

বড়রাণীরা ছোটরাণীর মুখের কাছে রঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া, নথ নাড়িয়া, বলিয়া উঠিল,—"ছেলে না, হাতী হইয়াছে, —ওঁর আবার ছেলে হইবে!—ক'টা ইঁদুর আর ক'টা কাঁকড়া হইঁয়াছে।"

শুনিয়া ছোটরাণী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

নিষ্ঠুর বড়রাণীরা আর শিকলে নাড়া দিল না। চুপি-চুপি হাঁড়ি-সরা আনিয়া, ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশ-গাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার পর শিকল ধরিয়া টান দিল।

রাজা আবার ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মাণিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে আসিলেন;—বড়রাণীরা হাত মুছিয়া, মুখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কতকগুলি ব্যাঙের ছানা ইঁদুরের ছানা আনিয়া দেখাইল।

দেখিয়া, রাজা আগুন হইয়া, ছোটরাণীকে রাজপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

বড়রাণীদের মুখে আর হাসি ধরে না;—পায়ের মলের বাজনা থামে না। সুখের কাঁটা দূর হইল; রাজপুরীতে আগুন দিয়া ঝগড়া-কোন্দল সৃষ্টি করিয়া ছয় রাণীতে মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

পোড়াকপালী ছোটরাণীর দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদীনালা শুকায়—ছোটরাণী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী হইয়া, পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

—দুধের সাগর—

(২)

এমনি করিয়া দিন যায়। রাজার মনে সুখ নাই, রাজার রাজ্যে সুখ নাই,—রাজপুরী খাঁ-খাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না,—রাজার পূজা হয় না।

একদিন, মালী আসিয়া বলিল—"মহারাজ, নিত্যপূজার ফুল পাই না, আজ যে, পাঁশগাদার উপরে, সাত চাঁপা এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটিয়া রহিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"তবে সেই ফুল আন, পূজা করিব।"

মালী ফুল আনিতে গেল।

মালীকে দেখিয়া পারুলগাছে পারুলফুল চাঁপাফুলদিগে ডাকিয়া বলিল,—"সাত ভাই চম্পা জাগ রে!"

অমনি সাত চাঁপা নাড়িয়া উঠিয়া সাড়া দিল,—

"কেন বোন্ পারুল ডাক রে।"

পারুল বলিল,—"রাজার মালী এসেছে,

পূজার ফুল দিবে কি না দিবে?"

সাত চাঁপা তুর্‌তুর্ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—"না দিব, দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,

আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল!"

দেখিয়া শুনিয়া মালী অবাক্ হইয়া গেল। ফুলের সাজি ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া, রাজার কাছে খবর দিল।

আশ্চর্য্য হইয়া, রাজা, রাজসভার সকলে সেইখানে আসিলেন।

রাজা আসিয়া ফুল তুলিতে গেলেন, অমনি পারুলফুল চাঁপা-ফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল,—

"সাত ভাই চম্পা জাগ রে!"

চাঁপারা উত্তর দিল,—"কেন বোন্ পারুল ডাক রে?"

পারুল বলিল,—"রাজা আপনি এসেছেন,

ফুল দিবে কি না দিবে?

চাঁপারা বলিল,—"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,

আগে আসুক রাজার বড় রাণী,

তবে দিব ফুল।"

বলিয়া, চাঁপাফুলেরা আরও উঁচুতে উঠিল।

রাজা বড়রাণীকে ডাকাইলেন। বড়রাণী, মল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া ফুল তুলিতে গেল। চাঁপাফুলেরা বলিল,—

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার মেজরাণী, তবে দিব ফুল।"

তাহার পর মেজ-রাণী আসিলেন, সেজ-রাণী আসিলেন, ন-রাণী অসিলেন, কনে-রাণী আসিলেন, কেহই ফুল পাইলেন না। ফুলেরা গিয়া আকাশে তারার মত ফুটিয়া রহিল।

রাজা গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

শেষে দুয়োরাণী আসিলেন; তখন ফুলেরা বলিল,—

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী,
তবে দিব ফুল।"

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজা চৌদোলা পাঠাইয়া দিলেন, পাইক বেহারারা চৌদোলা লইয়া মাঠে গিয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরাণীকে লইয়া আসিল।

ছোটরাণীর হাতে পায়ে গোবর, পরণে ছেঁড়া কাপড়, তাই লইয়া তিনি ফুল তুলিতে গেলেন। অমনি সুরসুর করিয়া চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, পারুল ফুলটি গিয়া তা'দের সঙ্গে মিশিল; ফুলের মধ্য হইতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মত সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরাণীর কোলে-কাঁখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সকলে অবাক্! রাজার চোখ দিয়া ঝরঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া গেল। বড়রাণীরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

রাজা তখনি বড়রাণীদিগে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়া, সাত-রাজপুত্র, পারুল-মেয়ে আর ছোটরাণীকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন।

রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

"কোনারকের পথে ভূত"

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেইবারেই আমি ভূত দেখি। সত্যিই।

উড্রফ, ব্লাণ্ট্ কোনারক দেখে এসে বললেন, 'যাও, দেখে এসো আগে সে মন্দির।' একদিন রওনা হলুম কোনারকে, চারখানা পালকিতে লাঠি লণ্ঠন লোকজন স্ত্রীপুত্রকন্যা সব সঙ্গে নিয়ে। 'পথে বিপথে' বইয়ে আছে এই বর্ণনা। কুড়ি মাইল পথ বালির উপর দিয়ে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, সারারাত। পান, তামাক, খাবার জলের কুঁজো পালকির ভিতরে তাকে ঠিক ধরা; মিষ্টান্নের ভাঁড়ও একটি; পাশে লাঠিখানা। পালকি চলেছে 'হুম্পা হুয়া'। পুরী ছাড়িয়ে সারারাত চলেছি—ভয়ও হচ্ছে, কী জানি যদি বালির মাঝে পালকি ছেড়ে পালায় বেহারারা। আমার আগে আগে চলেছে তিনখানা পালকি। মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছি, 'ঠিক আছিস সবাই?' সুনসান বালি, কোথায় যে আছি—বাতাসে না পৃথিবীতে কিছু বোঝবার উপায় নেই। থেকে থেকে ধপাস্ ধপাস্ শব্দ, বেহারাদের আট-দশটা পা পড়ছে বালিতে। এক জায়গায় শুনি ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ শব্দ।

'কী হল রে?'

'বাবু, নিয়াখিয়া নদী আসি গেলাম।'

'ও, আচ্ছা বেশ।'

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম্ যাগে নেই? আল্‌বট্ যানে হোগা।

চৌকি। চল্‌বে, থানেমে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা! (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন্, হাম্ ডেক্‌টা ওস্কা কুচ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্‌কো তো কুচ দিয়া নেহিঁ—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজাকি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্।

সার। মম্! ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী! রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরয়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাক্‌তে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

"কাঠগোড়ায় কালা সাহেব জন ডিকশন"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন ডিকশন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো। তা হলে কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগাঁয়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে অনেক রংদার লোক ছুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডেপুটির কাছে হইবে তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট, তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালীটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডেপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা সেকেলে বুড়ো—নিরীহ রকম ভালো মানুষ! জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে কনেষ্টবল মহাশয়রা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকাবাঁকা বুলিতে বলিলেন—"সে হামাকে তোমরা হেখানে কেন আনিলে ?

হাকিম বলিল—কি জানি সাহেব! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ ?

সাহেব। যা করে না কেন, তোমার সাথে আমার কোন বাট হোবে না।

হাকিম। কেন, সাহেব ?

সাহেব। তুমি কালা বাঙ্গালী আছে।

হাকিম। তারপর?

সাহেব। আমি সাহেব আছে।

হাকিম। তা ত দেখছি—তাতে কি হলো?

সাহেব। তো তোমার—কি বলে? সেটা লেই।

হাকিম। তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকাবাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন? কি নেই?

সাহেব। সেই যাতে মোকদ্দমা করে—সে তুমি জানে না?

হাকিম। সাহেব আমি ভালো মানুষ—তোমায় এখনও কিছু বলি নাই—কিন্তু আর তুমি তুমি করিও না—জরিমানা করিব।

সাহেব। তুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না—আমি সাহেব আছে সেই সেটা কি বলি সেটা লেই?

হাকিম। কি নেই সাহেব?

সাহেব। সেই সে—জুষ্টিকেশন?

হাকিম। ও হো -**Jurisdiction**। বটে। তুমি কি বিলাতী সাহের?

সা। হামি সাহেব আছে।

হা। রংটা এত কালো কেন?

সা। মুই কোয়লার কাম করেছিল।

হা। তোমার বাপের নাম কি?

সা। বাপের নামে কোর্টের কি কাম আছে?

হা। বলি সেটা জানা আছে কি?

সা। আমার বাপ বড় আদমী ছিলো—লোকন নামটা এখন মনে পড়ছে না।

হা। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি?

সা। আমার নাম জান সাহেব—জান ডিকসন্?

হা। বাপের নাম ডিকসন্ নয়?

সা। হোবে—ডিকসন্ হোতে পারে লেকেন—

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল—'হুজুর, ওর বাপের নাম

গোবর্দ্ধন সাহেব।' সাহেব রাগ করিয়া বলিল,—গোবর্দ্ধন হইলো ত কি হইলে—তোমার বাপের নাম ত রামকান্ত—তোমার বাপ চূড়া বেচিত—আমার বাপ বড় আদমী ছেলো।'

হা। তোমার বাপ কি করিত ?

সা। বড় লোকের সাদি দিত।

হা। সে আবার কি ? ঘটকালি করিত না কি ?

মোক্তার। আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনায় জয়ঢাক ঘাড়ে করিত। অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিসডিকসনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নধর কালো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল নিম্নে লিখেতেছি—

প্রশ্ন। তোমার নাম কি ?

উত্তর। রুক্মিণী জেলেনী।

প্রশ্ন। তুমি কি কর ?

উত্তর। বিলে খালে মাছ ধরে বেচি।

আসামী কহিল,—ঝুটা বাত। ও সুঁটকী মাছ বেঁচে। জেলেনী বলিল,—"তাও বেচি। তাইতেই ত তুমি মরেছ।'

প্রশ্ন। তোমার কিসের নালিশ ?

উত্তর। চুরির নালিশ।

প্রশ্ন। কে চুরি করেছে ?

উত্তর। (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগদীর ছেলে।

সাহেব। মুই সাহেব আছে—মুই বাগদী নেই।

প্রশ্ন। কি চুরি করেছে ?

উত্তর। এই ত বলিলাম—এক মুঠা সুঁটকী মাছ।

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল ?

উত্তর। আমি ডালা পাতিয়া তাতে সুঁটকী মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম—একজন খদ্দের এলো—তা তার পানে ফিরে কথা

কইতে ছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পকেটে পুরিল।

প্রশ্ন। তারপর তুমি টের পেলে কেমন করে?

উত্তর। পকেটের যে আধখানা বই ছিল না—তা সাহেবের মনে ছিল না। সুঁটকী মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল—'না বাবুজি! ওর চুপড়িটাই ফুটো, তাই মাছ বেরইয়ে পড়েছিল।' জেলেনী বলিল,—'ওর পকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।'

সাহেব বলিল,—'সে মুই দাম দেব বলে নিয়েছিল।'

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে সাহেব সুঁটকী মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম, জবাব লিখিতে বসিলেন। সাহেব জবাবে, কেবল এই কথা বলিলেন যে, বাঙ্গালীর আমার উপর 'জুষ্টিকেশন নেই। সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলে।

শাঁকচুন্নী—বৌ

—রেভঃ লালবিহারী দে

এক ব্রাহ্মণ ছিলো। সেই ব্রাহ্মণ তার মা আর বৌয়ের সংগে থাকতো বাড়ীতে। তাদের বাড়ীর কাছেই ছিলো এক পুকুর। আর সেই পুকুরের পাড়ের এক গাছের গর্তে বাস করতো এক শাঁকচুন্নী।

শাঁকচুন্নী কাকে বলে জানতো?

তারা হচ্ছে মেয়ে ভুত। দেখতে সাদা। গভীর রাতে ঐ

শাঁকচুন্নী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হতো যেন একটা সাদা কাপড়ের থান ঝুলছে।

একদিন রাতে সেই ব্রাহ্মণ-বৌয়ের পুকুরে যাওয়ার দরকার পড়লো। পুকুর পাড়েই দাঁড়িয়েছিল শাঁকচুন্নীটা। শাঁকচুন্নীর গায়ে ঠেকা লাগলো বৌয়ের। দারুণ ক্ষেপে গেলো সে বৌটার ওপর।

ধরলো তার গলা টিপে। গাছের ডালে একটা গর্ত ছিলো। সেই গর্তটার মধ্যে ব্রাহ্মণ বৌটাকে ঢুকিয়ে দিলো। ভয়ে আধমরা হয়ে গর্তটার মধ্যে পড়ে রইলো। ব্রাহ্মণ বৌয়ের পোষাকে সেজে পেত্নীটা ব্রাহ্মণের ঘরে হাজির হলো। এই বিরাট পরিবর্তন ব্রাহ্মণ আর তার মা কেউ বুঝতে পারলো না। ব্রাহ্মণ ভাবলো বৌ তার পুকুর থেকে ফিরে এলো। এবং মা-ও ভাবলো তার বৌ-ই বটে।

পরের দিন সকালে শাশুড়ী তার ছেলের বৌয়ের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। শাশুড়ী জানতো তার বৌ দুর্বল আর আলসে ধরণের। বাড়ীর কাজ করতে তার অনেক সময় লাগে। কিন্তু সে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। হঠাৎ-ই সে কাজে যেন ভীষণ চতুর। বিশ্বাস করা যায়না এতো তাড়াতাড়ি সে ঘরের কাজ-কম্ম সেরে ফেলে। কিন্তু শাশুড়ী অন্য কিছু সন্দেহ করতে পারে না, তাই বৌ আর ছেলেকে কোন কথা বলা হলো না। বরঞ্চ সে আনন্দ পেলো—থাক বৌটা তাহলে নতুন জীবন পেয়েছে।

ওমা! দিনে দিনে যেন বৌটা খুবই বেশী চতুর হচ্ছে! আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি রান্না-বান্না শেষ হতে লাগলো। শাশুড়ী হয়তো বৌকে বল্লো পাশের ঘর থেকে কোনো জিনিষ আনতে। একঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে যে সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে জিনিষ শাশুড়ী পেতে লাগলো। পেত্নী বৌ কিন্তু পাশের ঘরে যেতো না। সে লম্বা হাত বাড়িয়ে পাশের ঘর থেকে জিনিষ নিয়ে আসতো। ভূত পেত্নী বা শাঁকচুন্নী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের ইচ্ছামতো হাত

পা ছোটো বা বড় করতে পারে। এভাবেই তারা জিনিষ পত্র নিয়ে থাকে

একদিন বুড়ী শাশুড়ীর চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়লো। বুড়ী তাকে অনেকটা দূর থেকে একটা বাসন আনতে বল্লো। শাঁকচুন্নীটা অন্যমনস্কভাবে বেশ কয়েক গজ হাতটা লম্বা করে নিমেষের মধ্যে জিনিষটা নিয়ে এলো। ওরে বাপ! ব্যাপারটা দেখেই বুড়ীর চোখ ছানাবড়া! ব্যাপারটা চেপে গেলো বুড়ী। কিন্তু ছেলেকে বল্লো। মা-বেটা দুজনেই বৌকে চোখে চোখে রাখলো তখন থেকে।

একদিন বুড়ী জানতো বাড়ীতে উনুনে আঁচ নেই। এবং বুড়ী এ-ও জানতো বৌ বাড়ীর বাইরে থেকে আগুনের কোনো ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু তবুও তার রান্নাঘরে আগুন গন্‌গন্‌ করছে। রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকলো বুড়ী আর চোখ কপালে তুল্লো। বৌটা তার একটা পা উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর আগুনে লাল হয়ে আছে উনুন। বৌটা কিন্তু আগুন জ্বলে এমন কোন কাঠ খড় নেয়নি।

বুড়ী-মা যা দেখলো ছেলেকে খুলে বল্লো। এবং তারা নিশ্চিন্ত হলো যে কম বয়সের এই কচি বৌটা তাদের নিজেদের বৌ নয়। এ নিশ্চয় শাঁকচুন্নী। মা যা দেখেছে ছেলেকে ঠিক সেই দেখালো।

ডাকা হলো ওঝা। এলো ভূত তাড়ানো লোকটা, প্রথমেই সে জানতে চাইলো বৌটা মানুষ না শাঁকচুন্নী। একটুকরো হলুদ আগুনে ধরিয়ে বৌয়ের সাজপরা পেত্নীর নাকের কাছে ধরলো।

হলুদ-পোড়া গন্ধ ভূত-পেত্নী কেউই সহ্য করতে পারে না। এই পরীক্ষায় কোনো ভুল হতে পারে না। নাকের কাছে জ্বলন্ত হলুদ ধরার সঙ্গে সঙ্গেই বৌ-টা চিৎকার করে উঠলো এবং এক ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। এতে স্পষ্ট ধরা পড়লো হয় বৌটা একটা পেত্নী না হলে তাদের সত্যিকারের বৌকে পেত্নীতে পেয়েছে।

ওঝা মন্ত্রে ধরা পড়লে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সে কে? প্রথমে সে কিছুতেই বলতে চাইছিলো না। মার! মার মার! ওঝার জুতো পেটায় মরো মরো হয়ে সে নাকী সুরে কথা বলতে

আরম্ভ করলো একসময়। তোমরা সকলেই জানো ভূত-পেত্নী খনা গলায় কথা বলে। বৌ স্বীকার করলো শাঁকচুন্নী সে। পুকুরের পাড়ের গাছে বাস করে। ব্রাহ্মণ-বৌকে সে গাছের ফোকরে ঢুকিয়ে রেখেছে। কারণ ও একদিন রাতে পেত্নীকে ছুঁয়ে দিয়েছিলো। যে কেউ একজন সেই গর্তে বৌ-টাকে দেখতে পাবে।

মরো মরো অবস্থায় ব্রাহ্মণ-বৌকে আনা-হলো। আবার জুতো পেটা করা খেলো শাঁকচুন্নীটাকে। ওরে মারের গুঁতো। স্বীকার করলো সে ব্রাহ্মণ আর তার পরিবারের ওপর কোনো ক্ষতি করবো না। মন্ত্রের বাঁধন উঠিয়ে ওরা তাঁকে দূর করে দিলো। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের বৌ রোগমুক্ত হলো। এবার ব্রাহ্মণ তার পরিবার নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলো। একসময় অনেক ছেলেমেয়ে সংসার ভরে গেলো তার।

আমার কথাটি ফুরলো,
নটে গাছটি মুড়লো, ইত্যাদি।

A Ghostly wife : বাংলা—শম্ভু ঘোষাল

নয়নচাঁদের ব্যবসা

—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

নয়নচাঁদের বাড়ী ফরাশ-ডাঙ্গা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা, নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্য-ক্রিয়ার ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে

নিয়াখিয়া নদী পেরিয়ে এলুম। শেষ রাত, চাঁদ অস্ত গেল, াবছা অন্ধকার, সকাল হতে আরো খানিকক্ষণ বাকি। সারা রাত চয়ে জেগে কাটিয়ে এলুম, এবারে একটু ঘুমও পাচ্ছে। সে সময় ূতের ভয়ও একবার জেগেছিল মনে। সামনের পালকিগুলো আর দখা যাচ্ছে না। বেহারাদের ডেকে বলি, 'ও বেহারা, সব ঠিক াছে তো?'

'সব ঠিক আছে বাবু, সব ঠিক আছে।'

এমন সময় দেখি, একটা লোক, এক হাতে লাঠি এক হাতে লণ্ঠন, লেছে আমার পালকির খোলা দরজার পাশে পাশে।

বলি, 'ও বেহারা, এ কে রে?'

'আঃ বাবু, ও দিকে দেখো না, ও সব দেউতা আছে।' ব'লে ও দকের দরজা বন্ধ করে দিলে।

দেউতা বলে ওরা ভূতকে। বলি, 'ও কী, লণ্ঠন হাতে দেউতা ী রে!'

খানিক বাদে দেখি ঘোড়ায় চড়ে একটা সাহেব টুপি মাথায় পাশ াটিয়ে গেল।

'বাবু, তুমি শুয়ে পড়ো।' বলে শুধু বেহারারা।

শুনেছিলুম কোন্ এক মিলিটারিকে ওখানে মেরে ফেলেছিল, ভূত য় সে ফেরে, অনেকেই দেখে।

রাত্তির বেলা লণ্ঠন হাতে লোকটাকে দেখে আমার বরং ভালোই াগেছিল।

যাক, এই করতে করতে এসে পৌঁছলুম সমুদ্রের ধারে কী একটা ন্দিরের কাছে, মেয়েরা সব নেমে দেখতে গেল। ছোট্ট একটি হাড়ের মতো, তার উপরে ছোটো মন্দিরটি। মণিলাল ছিল সঙ্গে; কে বললুম, 'ঠিক আছ তো সবাই? এইবার তবে আমি একটু শ-মোড়া দিয়ে নিই।' তার পর আমার পালকি পড়ল গিয়ে কবারে কোনারকের ধারে। সিন্ধুতটে চলেছে পালকি হু হু করে। জা খুলে দেখলুম ঢেউগুলো পাড়ে এসে পড়ছে, আবার চলে যাচ্ছে

পালকির নীচে দিয়ে। জলে ফস্‌ফরাস্‌, ঢেউ আসে যায়, যেন একটা আলো চলে যায়। মনে হয় সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, দানবরা কাঁধে করে নিয়ে চলেছে আমায়।

এইভাবে চলবার পর আবার একটা পালকি হু হু করে চলে গেল সামনে দিয়ে কোনারকের মন্দিরের দিকে, সঙ্গে আবার লণ্ঠন। ও কী, পালকি ও দিকে কোথায় গেল! নেমে দেখলুম আমাদের চারটে পালকি ঠিকই আছে। তবে ওটা কী?

বেহারারা ওই এক কথাই বলে, 'দেখো না বাবু, তুমি শুয়ে পড়ো।' কী দেখলুম তা হলে ওটা? মরীচিকা না কী কে জানে, তবে দেখেছিলুম ঠিকই। সকাল হয়ে গেছে, ভয় নেই। মণিলালদের জিজ্ঞেস করলুম, 'দেখেছ কিছু?'

বললে, 'না।'

ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে কোনারকের মন্দিরে পৌঁছলুম। মেয়েরা নেমেই মন্দির দেখবে বলে ছুটল।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের হাসির গল্প

[মধ্যপ্রাচ্য এবং রাশিয়ার সবচেয়ে রসিক মানুষ এই নাসিরুদ্দিন। আমাদের গোপাল ভাঁড়ের মতো। গল্প দুটো পড়ে বল তো কে বেশী রসিক মোল্লা নাসিরুদ্দিন না গোপাল ভাঁড়]।

(১)

বাজার থেকে এক সের মাংস এনে বিবিকে রাঁধতে বল্লেন একদিন। রান্নাটা খুব সুন্দর হয়েছিলো। চাখলেন একটু বিবি। আরেকটু। এভাবে চাখতে চাখতে মাংসের হাঁড়ি ফাঁকা।

খেতে এসে নাসিরুদ্দিন মাংস পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন

বিবিকে ব্যাপার কী। বিবি মুখিয়ে ছিলেন। বিড়ালের বাপান্ত করে বল্লেন ঐটাই সব গোস্ত খেয়ে সাফ করে দিয়েছে।

বোলাও বিড়ালকো। এলো বিড়াল। দাঁড়িপাল্লায় তাকে চাপানো হলো। ওজন হলো এক সের।

—এটা যদি বিল্লী হয়, মাংসটা গেলো কোথায়? আর এটা যদি মাংস হয়, বিল্লীটা কই?

রেগে মেগে বল্লেন মোল্লা নাসিরুদ্দিন।

(২)

একজন জিজ্ঞেস করলো,—তোমার বয়স কতো মোল্লা?

—চল্লিশ।

—সে কী দু বছর আগেও তো চল্লিশই বলেছিলে!

—বলে ছিলাম। কারণ ভদ্রলোকের এক কথা।

পুতুল

— সুখলতা রাও

রামুর বাবা কারিগর, মাটির পুতুল তৈরি করে। কত রকমের পুতুল থাকে তার দোকানে—নাক-তোলা, খোঁপা-তোলা মেয়ে পুতুল, গোঁফ পাকানো সিপাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া-চড়া মানুষ, আরও কত কি। রামু বাবার কাছে বসে বসে পুতুল গড়া দেখে, আর রং দেওয়া শেখে। পুতুল হয়ে গলে যে মাটিটুকু বাকি থাকে, তাই দিয়ে সে

নিজের মনের পুতুল গড়ে, তাদের গায়ে রং লাগায়। সে বড় ভোলা, তাই তার বাবা ভাল পুতুল তাকে আঁকতে দেয় না।

সে-বছরে খুব বড় মেলা হবে রামুদের গ্রামে। রামুর বাবা অনেক পুতুল তৈরি করেছে মেলার জন্ম। রামুও তেরি করেছে তিনটা পুতুল, বড় মেজো আর ছোট। তাদের হাতে লাল সবুজ চুড়ি এঁকে দিয়েছে, গলায় দিয়েছে পুঁতির মালা, কানে গয়না। তার পরে নাক-মুখ-চোখ আঁকতে বাকী। বড়র কালো চুল আর খোঁপা আঁকতে সে তার কানই আঁকতে ভুলে গেল। মেজোর খোঁপা ঘাড়ের কাছে, জোড়া ভুরু, টানা টানা চোখ, কিন্তু সে চোখের মণি আঁকতেও ভুলে গেল রামু। ছোটটি সব চেয়ে স্নুন্দর দেখতে। তার নাক চোখ নিখুঁত হল।

মেলার দিনে রামুর বাবার দোকানে কত পুতুল সাজানো হয়েছে! কৃষ্ণনগর থেকে এসেছে সত্যিকারের মানুষের মত খানসামা, বাবুর্চি, আয়া, ঝাড়ুদার, ফলওয়ালী, ভিস্তি পুতুল। তাদের সাজানো হয়েছে সব উপরের তাকে। তার নীচের তাকে যত দেশী ধরনের পুতুল, রামুর বাবার হাতে গড়া। তাদের পাশে রামুর বড়, মেজো, ছোটও আছে। নীচের তাকে আছে বেড়াল, কুকুর, হাতী, পক্ষীরাজ-ঘোড়া, পাখি এইসব।

রামু বসে পাহারা দিচ্ছে তাদের দোকানে। রাত অনেক হয়েছে। রাত্রি হলে নাকি পুতুলেরা কথাবার্তা বলে, রামু শুনেছিল কার কাছে। হঠাৎ তার কানে গেল, কে যেন বলছে, "ঐ আয়াটারই কাজ। আস্কারা পেয়ে পেয়ে ভারি বেড়ে গেছে।" বলছিল উপরের তাকে বাবুর্চি পুতুল মাছ ভাজতে ভাজতে, "এখনি রেখে গেলাম চারখানা মাছ, এসে দেখছি দুখানা।" আয়া তখন রান্নাঘরে আসছিল দুধ গরম করতে, তার হাতে ছিল দুধের বাটি। কথাটা কানে যেতে সে খন্‌খনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "ফের এমন কথা মুখে আনবে তো মেমসাহেবকে বলে দেব। আমার কি মাছ খাবার কমতি আছে? খোকাবাবু যা না খায়, সব মাছ আমি খাই। ঐ ঝাড়ুদারই নিয়ে থাকবে, ঝাঁটা ঝুড়ি নিয়ে দরজার কাছে ঘোরাঘুরি করছিল।"

ঝাড়ুদার তখনও দরজার কাছে ঝাঁট দিচ্ছিল ; "আমি কেন রান্নাঘরে ঢুকতে যাব ? বাবুর্চি নিজেই হয়তো খেয়ে থাকবে, নইলে আর কে খাবে, মাছের তো পাখা গজায় নি।"

যেই না একথা বলা, বাবুর্চি ছুটে গেল বারান্দায়, তাতে আর ঝাড়ুদারেতে লেগে গেল হাতাহাতি। ঠিক সেই সময়ে আয়া দুধ নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোচ্ছিল। বাবুর্চি আর ঝাড়ুদার দুজনে ঝটাপটি করে পড়ল তার উপরে ; সেও অমনি বাটিটাটি ফেলে দিয়ে গড়াতে গড়াতে দুম্ করে পড়ল গিয়ে নীচের তাকে। পড়ে তার নাকটা গেল ভেঙে, নাকের সোনার গহনা ছিট্‌কে পড়ল দূরে।

নীচের তাকে সেইখানে বসেছিল পাকা চুল ও পাকা দাড়িওলা ঘাড়-নাড়া বুড়ো। সে সবে হুঁকোতে টান দিচ্ছিল। আয়াকে পড়তে দেখে সে প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। তারপরে ঘাড় নেড়ে নেড়ে নিজের মনে বলতে লাগল, "উনি কে বটেন ? এমন করে ভিরমি লেগে গেলেন কেন ?" তারপর চেঁচিয়ে বলল, "বলি ও পাঞ্চালি, ও পাঞ্চালি। অমন সটান শুয়ে আছ কেন ? কি হয়েছে তোমার ? হাত পা ভেঙেছে নাকি ?" আয়া ততক্ষণে উঠে বসেছে আর নাকে হাত দিয়েই হাউহাউ করে কাঁদতে লেগেছে, "আসছে মাসে আমার বিয়ে, আর নাকটা কিনা গেল ভেঙে।" বুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "বটে ? আসছে মাসে বিয়ে ? তা, ভাবনা করো না। আমাদের রামু খুব ভাল নাক গড়তে জানে। তাকে বলে দেব বিয়ের আগেই তোমার নাক মেরামত করে দেবে।" বলে বুড়ো ভাবতে লাগল, "ও বৌ-পুতুল, এনাকে নিয়ে যাও, এই পাঞ্চাল দেশের মেয়েকে নিয়ে যাও।" আয়া কান্না থামিয়ে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করল, "কি বললে ? কোন দেশের মেয়ে বললে ?" "পাঞ্চাল দেশের সেই যেখানে মহাভারতের দ্রৌপদী জন্মেছিলেন গো।" "পাঞ্চাল-ফাঞ্চাল বুঝি-না, দক্ষিণ দেশে আমার বাড়ি।" "হাঁ হাঁ সেই হল। তোমার কাপড় দেখে বুঝতে পারছি কিনা।"

বলল বুড়ো। এতক্ষণে বৌ-পুতুল এসে আয়ার হাত ধরে তুলে নিয়ে গেল।

অন্দর-মহলে আহ্লাদী পুতুল আরাম করে পা তুলে বসেছিল আর হাসছিল। ননী-গোপাল হামা দিয়ে এসে তার কাছে হাত বাড়িয়ে দিল, ননীর জন্য। গোপালকে দেখেই আয়ার মনে পড়ে গেল খোকাবাবুর কথা। সে টপ্ করে তাকে কোলে তুলে নিল। গোপালের কিন্তু সেটা পছন্দ হল না। তার মা যশোদার আর আহ্লাদী পুতুলের গায়ের রং কেমন টকটকে। এই নতুন মেয়ের চোহারা মোটেই সে রকম নয়, কাপড়ও কেমন কেমন। খোকা তাড়াতাড়ি ছট্‌ফট করে নেমে পড়ল তার কোল থেকে।

আহ্লাদী আয়াকে কাছে ডেকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। বৌ-পুতুলও বসল সেখানে। বড়, মেজো, সেজোও সুড় সুড় করে এসে দাঁড়াল। আহ্লাদী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে কি করে এলে বাছা ?" আয়া তাদের বলল, কেমন করে বাবুর্চি আর ঝাড়ুদারে মিলে লডালড়ি করতে করতে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এই নীচের তলায়, আর কেমন করে তার নাকটা—। এইটুকু বলেই সে আবার কাঁদতে শুরু করলো নাকের শোকে। আহ্লাদী জিব দিয়ে চুক্‌চুক্ শব্দ করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আহা, সত্যিই তো, দুঃখ হবার কথা বই কি।" আয়া তাতে আরও বেশী কাঁদতে কাঁদতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, "আমার নাক ভেঙে গেল গো। আসছে মাসে যে আমার বিয়ে গো। কি হল গো। ভাঙা নাক নিয়ে কি বিয়ে হয় ?" আহ্লাদী পরামর্শ দিল, "বিয়ের দিন না হয় ঘোমটাটা বেশী করে টেনে দিও। কেউ নাক দেখতে পাবে না।"

এই সব কথাবার্তা শুনে অন্যদের হাসি পাচ্ছে। মেজো ছেলে-মানুষ, সে হিহি করে হেসেই ফেলল। বড় তো কিছু শুনতে পাচ্ছে না, সে সেজোর হাসি দেখে তার দিকে কট-মটিয়ে তাকিয়ে বলল "এই চুপ। লোকের নাক ভেঙে গেছে, আর তুই হাসছিস ?" নাক তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। বলছে 'ভাঙা নাক নিয়ে কি বিয়ে

হয়?’ আবার আহ্লাদী মাসি বলছে ঘোমটা টেনে দিতে। হি হি হি—” বলল সেজো। তার হাসি আর থামেই না। বড় রেগে গিয়ে তাকে এক ঠেলা মারল। মেজো চোখে দেখতে পায় না, হঠাৎ ঠেলা খেয়ে সে বেচারা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল বৌপুতুলের উপরে। বৌপুতুল পড়ল আয়ার ঘাড়ে, আর সকলে মিলে গিয়ে পড়ল আহ্লাদীর ঘাড়ে। আহ্লাদী মোটা মানুষ, সে একেবারে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল কুমড়োর মত। তাই দেখে, ভয়ে গোপাল চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

তখন ছোট দৌড়াল বুড়োর কাছে নালিশ করতে। সে বেচারা কথা বলতে পারে না; রামু তার ঠোঁট আঁকতে আঁকতে শেষ করেনি, কেবল একটা লাল আঁচড় কেটেছে মাত্র সেই সরু ফাঁক দিয়ে বাঁশির মত সুরে সে চেঁচাতে লাগল, “ইঁ ইঁ ইঁ” আর দেখতে লাগল অন্দরের দিকে। বুড়ো হুঁকো হাতে নিয়ে, মাথা ঠক্‌ঠক্ করতে করতে উঠে এসে কোন কিছু না শুনেই সকলকে দিল ধমকে। তারপর গলা বার করে দিল, “ওহে পক্ষীরাজ ঘোড়াওলা, একবার এসো তো উপরে। এই পাঞ্চালীকে দিয়ে এস তার জায়গায়।”

পরদিন সকালে উঠে রামু আগে আয়ার নাক মেরামত করলো। তারপর বড়র কান এঁকে দিল, মেজোর চোখের মণি এঁকে দিল, আর ছোটর মুখে এঁকে দিল লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট। সেদিন সকালেই রাজপুত্রের মত সুন্দর একটি খোকা এসে ছোট বড় মেজো তিনজনকেই কিনে নিয়ে গেল।

ফিঙে আর কুঁক্ড়ো

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

একটা দানব ছিল, তার নাম ছিল ফিঙে; সে দেড়শো হাত লম্বা শালগাছের ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াত। আরেকটা দানব ছিল, তার নাম কুঁকড়ো। সে ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দিত।

আর যত দানব ছিল, তাদের সকলকেই কুঁকড়ো ঠেঙিয়ে ঠিক করে দিয়েছে, এখন সে ফিঙের সন্ধানে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। একথা শুনে অবধি ফিঙের আর ঘুম হয় না, কাজেই সেও কুঁকড়োকে এড়াবার জন্য খালি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। ফিঙে সমুদ্রের ধারে

গেল, তা শুনে কুঁকড়ো সেই দিক পানে রওনা হল। সে খবর পেয়েই ফিঙে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তার নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরখানি ছিল একটা উঁচু পর্বতের উপর; সেখান থেকে দশ দিনের পথ অবধি দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই ফিঙে ভাবল যে ওখানে গেলে কুঁকড়ো নিতান্ত আচমকা এসে তাকে মারতে পারবে না। ফিঙেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখে তার স্ত্রী উনা বলল 'কী হয়েছে?' ফিঙে আঙুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ কুঁকড়ো আসছে! বেটা ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দেয়। এবারে দেখছি ভারী বেগতিক।'

উনা সেদিকে দেখল, সত্যি সত্যিই কুঁকড়ো আসছে, কিন্তু এখনও সে ঢের দূরে, তিন-চার দিনের কমে এসে পৌঁছবে না। তখন সে ফিঙেকে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। তুমি পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকো, আমি কুঁকড়োকে ঠিক করে দিচ্ছি।' কিন্তু ফিঙের মনের ভয় তাতে গেল না। সে মাথা হেঁট করে বসে কত কথাই ভাবতে লাগল।

উনা কিন্তু ততক্ষণে চুপ করে ছিল না। সে গ্রামের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যার ঘরে যত ভাঙা দা, কুড়ুল, কাস্তে, খন্তা কোদাল, হুড়কো, ছিটকিনি আর হাতুড়ি আর পেরেক ছিল, সব চেয়ে ঝুড়ি ভরে নিয়ে এল। তারপর সেইগুলো ভিতরে পুরে পুরে সে দুদিন ধরে খালি পাটিসাপটাই তয়ের করল। ফিঙে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর বলে, 'ও কী করছ?' উনা বলে, 'যাই করি না কেন,—তুমি চুপ করে থাকো।'

পিঠে হয়ে গেলে উনা তিন গামলা ছানাও তয়ের করল। তারপর ফিঙেকে অনেক পরামর্শ দিয়ে, অনেক সন্ধান শিখিয়ে রেখে, সে সব ঠিকঠাক করে রাখল। এখন কুঁকড়ো এলেই হয়।

পরদিন দুপুরবেলায় কুঁকড়ো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেই ভয়ংকর গর্জনে আকাশপাতাল কাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ফিঙে কোথায়?' উনা বলল, 'সে তো বাড়ি নেই। কুঁকড়ো বলে নাকি

একটা ছোকরা তাকে খুঁজতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভারী বড়াই করছিল, তাই শুনে ফিঙে বিষম রেগে লাঠি হাতে তাকে মারতে বেরিয়েছে। যদি তাকে দেখতে পায় তবে আর বেচারাকে আস্ত রাখবে না।'

তা শুনে কুঁকড়ো ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আমিই তো কুঁকড়ো, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।' কথায় উনা হো হো করে হেসেই কুটিপাটি। তারপর অনেকক্ষণ নাক সিঁটকিয়ে কুঁকড়োর পানে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এই টিকটিকির মত জোয়ানটি হয়ে তুমি ফিঙের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অমন কাজও করতে নাই বাছা। কেন ফিঙের হাতে প্রাণ দেবে? আমার কথা শুনে চলো, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ একটা কাজ কর দেখি; বড্ড হাওয়া আসছে, ফিঙে বাড়ি নেই, কে ঘরখানিকে ঘুরিয়ে দেবে? দেখো তো তুমি পার কিনা।'

কুঁকড়ো ভাবলো, 'বাবা! হাওয়া থামাতে হলে ফিঙে এই ঘরটাকে ঘুরিয়ে দেয় নাকি? এখন আমি যদি "না" বলি তবে তো দেখছি আমার বড্ড নিন্দে হবে।' তখন সে আগে খুব করে তার ডান হাতের মাঝের আঙুলটা মটকে নিল। আঙুলটাতেই তার যত জোর ছিল, ওটি না হলে সে কিছুই করতে পারত না। আঙুল মটকানো হয়ে গেলে সে তুহাতে ঘরখানিকে জড়িয়ে ধরে তাতে এমনি পাক দিল যে দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়া সুদ্ধ ঘরখানি ঘুরে গেল।

এতক্ষণ ফিঙে কী করছে? সে উনার পরামর্শে তার নিজের খোকা সেজে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আর কুঁকড়োর কাণ্ড দেখে সেই কাঁথার ভিতরে ভয়ে ঘেমে আর কেঁপে অস্থির হচ্ছে।

এদিকে উনা আবার কুঁকড়োকে বলল, 'বেশ বাপু! লক্ষ্মী ছেলে তুমি। আহা! ঘরে এক ফোঁটা জল নেই, তোমাকে কী দিয়ে একটু মেঠাই খেতে দিই। পাহাড়টার নীচে জল থাকে, ফিঙে পাহাড় সরিয়ে তাই তুলে আনে। আজ তো সে বাড়ি নেই, এখন উপায় কী হবে? দেখো তো বাপু তুমি পাহাড়টা ঠেলে, একটু জল আনতে পার কি না!'

কুঁকড়ো আবার খুব করে তার আঙুল মটকে নিয়ে, সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে এমনি গুঁতো মারল যে তাতে দশহাত গভীর এক প্রকাণ্ড দীঘি হয়ে গেল, আর তাতে জলও হল তেমনি। তা দেখে উনা আর একটু হলেই 'মাগো!' বলে চেঁচিয়ে ফেলছিল, কিন্তু সে ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'চলো, এখন তোমাকে কিছু পিঠে খেতে দিই গে।'

এই বলে উনা কুঁকড়োকে ঘরে এনে দিয়েছে সেই পিঠে খেতে। সে বেটাও এমনি লোভী—একেবারে তার দশটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে। দিয়েই সে 'উঃ—হুঃ—হুঃ' বলে এমনি ভয়ংকর চেঁচিয়ে উঠল যে, আর একটু হলেই তাতে ঘরের ছাত উড়ে যেত। বেজায় ব্যস্ত হয়ে সেই পিঠে চিবোতে গিয়ে তার চারটে দাঁত ভেঙ্গে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছে, কাজেই না চেঁচাবে কেন?

উনা তখন বলল, 'আরে, অত চেঁচিও না, খোকার ঘুম ভেঙে যাবে। আমি ভাবছিলাম তুমি জোয়ান লোক, ঐ পিঠে খেতে তোমার ভাল লাগবে। ফিঙে আর খোকা ও পিঠে খুব খায়।'

বলতে বলতে সেই খোকাটা কাঁথার ভিতর থেকে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলল, 'অঁ-য়্যা-া-া বদ্দ খিদে পেয়েথে! পিতে থাব। খোকার গলার সে আওয়াজ শুনেই তো কুঁকড়োর পিলে চমকে উঠেছে। উনা অবশ্য খোকার জন্য ভালো পিঠে করে রেখেছিল। তাই থেকে কয়েকটা খেতে দিল। কুঁকড়ো তো আর তা জানে না, সে দেখল, যাতে তার নিজের দাঁত ভেঙে গেছে, 'খোকা' তাই কপাকপ খাচ্ছে। কাজেই সে ভাবল, 'বাবা গো, খোকাই যদি অমনি পিঠে খেতে পারে তবে তার বাবা না জানি কী করতে পারে! ভাগ্যিস সে বেটা বাড়ি নেই।'

এমন সময় 'খোকা' আবার বলল, 'পাথল দে। দল বা'ল কব্ব!' উনা তার এতকাল ছানা, আর কুঁকড়োকে একটা সাদা পাথর দিয়ে বলল, 'খোকার ঐ এক খেলা,—পাথর চিপে জল বার করে। তুমিও একখানা পাথর টিপে দেখো তো।' কুঁকড়ো সেই পাথর প্রাণপণে

টিপেও তা থেকে জল বার করতে পারল না। খোকার ছানা থেকে অবশ্য জল বার হতে লাগল। তা দেখে কুঁকড়ো ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বাবা গো! আমি এইবেলা পালাই। এই খোকার বাবা এলে আমাকে আস্ত রাখবে না। আমার খালি দেখতে ইচ্ছা করছে যে এই খোকার দাঁতগুলো কেমন যা দিয়ে সে ঐ পিঠেগুলো খায়।'

এই বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে যেই 'খোকা'র মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি খোকাও কটাস করে তার সব-কটি আঙুল একেবারে গোড়াশুদ্ধ কামড়িয়ে নিয়েছে। সেই আঙুলেই নাকি ছিল কুঁকড়োর জোর, কাজেই সে আঙুল কাটা যেতে হায় হায় করে মাটিতে পড়ে গেল। 'খোকা'ও তখন লাফিয়ে উঠে তার সেই দেড়শো হাত লম্বা শালের ছড়িগাছি দিয়ে তার হাড় ভাঙতে আর কিছু মাত্র দেরি করল না।

হ-য-ব-র-ল

—সুকুমার রায়

আমি ভাবছি এই বেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কি রকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি

মেরে দেখি, একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, —'এই গেল —নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল!'

হঠাৎ আমায় দেখে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।'

আমি বললাম, 'তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন?'

জন্তুটা বলল, 'কেন হাসছি শুনবে? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙ্গায় এসে পড়ত, আর ডাঙ্গায় মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচ্-প্যাচ্ কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—এই বলে সে আবার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, কি আশ্চর্য! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ?'

সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, 'না, না, শুধু এর জন্য নয়। মনে কর, একজন লোক আসছে তার একহাতে কুলপি বরফ আর একহাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, 'কেন তুমি এইসব অসম্ভব কথা ভেবে খামখা হেসে-হেসে কষ্ট পাচ্ছ?'

সে বলল, 'না, না, সব কি আর অসম্ভব? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—

জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার ভারি অদ্ভুত লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে? তোমার নাম কি?'

খানিকক্ষণ ভেবে বলল, আমার নাম হিজি-বিজ্-বিজ্। আমার

নাম হিজি- বিজ. বিজ্। আমার ভায়ের নাম হিজি-বিজ্-বিজ্। আমার বাবার নাম হিজি্-বিজ্-বিজ্। আমার পিশের নাম হিজি-বিজ্-বিজ্—'

আমি বললাম, 'তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টি শুদ্ধ সবাই হিজি-বিজ্-বিজ্।'

সে আবার খানিক ভেবে বলল, তাতো নয়, আমার নাম তকাই। আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেশোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—,

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'সত্যি বলছ না বানিয়ে?'

জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, না, না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।'

আমার ভয়ানক রাগ হল, তেড়ে বললাম, একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত একটা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিগ্গেস্ করল, 'আমার কথা হচ্ছে বুঝি?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'না' কিন্তু কিছু না বলতেই তড়তড় করে সে বলে যেতে লাগল, তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিষ আছে যা ছাগল খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে—ছাগল কিনা খায়।' এইবলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—'হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজ্-বিজ্-বিজ্ আমার গলার সার্টিফিকেট দেখেই বুঝতে পারছ 'যে আমার নাম ব্যাকরণ শিং বি. এ. খাদ্য বিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি; তাই আনার নাম ব্যাকরণ আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরাজিতে লিখবার সময় লিখি B. A. অর্থাৎ ব্যা।.........

নিরেট গুরুর কাহিনী

—সীতা দেবী

কোন এক গ্রামে একজন গুরু বাস করিতেন; তাঁহার নাম নিরেট। তাঁহার পাঁচজন শিষ্য; তাহাদের নাম, আকাট, হাবা, হাঁদা, বোকা এবং আহম্মক।

কাছাকাছি গ্রামে গুরুর যে সব শিষ্য বাস করিত, তাহাদের দর্শন দিবার জন্য এঁরা ছজন বাহির হইয়াছিলেন। কাজ শেষ করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিবার পথে, একদিন রাত্রে তৃতীয় প্রহরে তাঁহারা একদিন নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন।

গুরুর ধারণা ছিল নদীটি ভারি নিষ্ঠুর; সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে

ততক্ষণ পার হইবার মোটেই সুবিধা হইবে না। নদী ঘুমাইয়া আছে কি জাগিয়া আছে, জানিয়া আসিবার জন্য তিনি একজন বোকাকে হুকুম করিলেন। বোকা তখন বিড়ি টানিতে ছিল। তাহারই আগুনে সে একটা মশাল জ্বালিল, এবং সেইটি হাতে লইয়া চলিল। নদীর কাছে আসিয়া, জল হইতে বেশ খানিক দূরে থাকিয়াই, হাত বাড়াইয়া মশালটিকে জলে ডুবাইয়া দিল।

জলে দিবামাত্র হুস হুস শব্দ করিয়া উঠিল এবং ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোকা সেখান হইতে দে ছুট। কতবার সে যে আছাড় খাইল ও গড়াইয়া পড়িল, তাহার ঠিকই নাই, কিন্তু সেদিকে মোটেই তাহার খেয়াল ছিলো না। সে দৌড়িতে দৌড়িতে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'গুরুমশায়, গুরুমশায়, এখন নদী পার হবার সময় মোটেই নয়, ও জেগে রয়েছে। আমি তাকে যেই না ছোঁওয়া, সে অমনি রেগে ফোঁস ফোঁস করে উঠল। আর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমার দিকে লাফিয়ে এলো। আমি যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি এই আশ্চর্য!' তাহার কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন, 'আমরা দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না। এসো, আমরা এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করি।' ইহা বলিয়া গুরু তাঁহার শিষ্যদের লইয়া নিকটে এক বাগানে গিয়া বসিলেন। সময় কাটাইবার জন্য প্রত্যেকে এই নদীর বিষয় এক একটি গল্প বলিতে লাগিল। আকাট বলিল—'আমি আমার ঠাকুরদার কাছে এই নদীটির চালাকি আর অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। আমার ঠাকুরদাদা একজন মস্ত সওদাগর ছিলেন। একদিন তিনি আর তাঁর একজন বন্ধু গাধার পিঠে নুন বোঝাই করে আসছিলেন। নদীতে নেমে মাঝামাঝি এসে তাঁরা একবার স্নান করে নিলেন, জলটা মোটে তাঁদের কোমর অবধি ছিল; গ্রীষ্মকাল বলে তাঁরা একটু ক্লান্তও হয়েছিলেন। তারপর গাধাগুলোকে থামিয়ে, তাঁরা সেগুলোকেও বেশ করে স্নান করিয়ে দিলেন।

নদী পার হয়ে এসে দেখেন কী—নদীটা সব নুন চুরি করে

নিয়েছে। শুধু তাই নয়, নুনটা যাদু করে বের করেছে; কারণ বস্তাগুলোর মুখ আচ্ছা করে সেলাই করা ছিল, তা একটুও খোলেনি। ব্যাপার দেখে তো তাঁরা খুব ফুর্তি করে বলতে লাগলেন—বাপরে বাপ, এতখানি নুন খেয়ে ফেলেছে! আমাদের যে ছেড়ে দিয়েছে তাই বেজায় ভাগ্যি বলতে হবে।'

হাঁদা তখন আর এক গল্প আরম্ভ করিল—

'এই নদীটার ফন্দিফিকির আর চুরি আমার বয়সেই আমি ঢের দেখেছি। একবারের কাণ্ড শোন—একটা কুকুর একটুকরো মাংস নিয়ে এই নদীতে সাঁতার দিচ্ছিল, এমন সময় নদীটা ফন্দি করে নিজের জলের ভিতর আর এক টুকরো মাংস দেখাল। কুকুর বেচারা দেখল যে জলের ভিতর যে টুকরোটা রয়েছে, সেইটাই বড়। কাজেই সে নিজের মুখের মাংসটা ফেলে যেই সেটা নিতে গেল, অমনি দু টুকরোই উড়ে গেল। কুকুর আর কী করে, খালি পেটে বাড়ী ফিরল।

এইরূপে গল্প করিতে করিতে তাহারা দেখিল যে নদীর ওপার হইতে একজন ঘোরসওয়ার আসিতেছে। নদীতে তখন মাত্র এক বিঘ্যৎ-খানিক জল। কাজেই লোকটি নির্ভয়ে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়াই, ঝপ ঝপ করিয়া জল পার হইয়া এপারে আসিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া শিষ্যরা সকলে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হায় হায় আমাদের গুরুর যদি একটা ঘোড়া থাকতো, তাহলে আমরা সবাই নির্ভয়ে জলে নামতে পারতাম।' গুরু নিরেট বলিলেন, 'এ বিষয়ে আমাদের পরে কথা হবে।'

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল, কাজেই গুরু এক সময় আর একবার নদী জাগিয়া আছে কিনা পরীক্ষা করিতে পাঠাইলেন। এবারে হাবা আগেকার সেই মশালের কাঠখানা লইয়া চলিল এবং জলের কাছে গিয়াই কাঠখানা ডুবাইয়া দিল। কাঠখানার আগুন আগেই নিবিয়া গিয়াছিল, কাজেই এবারে একটুও শব্দ করিল না বা লাফাইয়া উঠিল না। ইহা দেখিয়া হাবা পরম আনন্দে ছুটিয়া চলিল এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'এইবার সময় হয়েছে। শিগগির

এসো, দেখো যেন টুঁ শব্দটিও করো না, নদীটা এখন ঘুমুচ্ছে, এখন আর ভয়-ডরের কোন দরকার নেই।'

হাবা চিৎকার করিয়া এই সুখবর দিবা মাত্র তাঁহারা সকলে লাফাইয়া উঠিল এবং একটা কথাও না বলিয়া তুজনে আসিয়া অতি সাবধানে জলে নামিল। তাহারা এত আস্তে আস্তে পা ফেলিতেছিল যে জলে কোনো রকম শব্দ হইল না। ভয়ে তখনও তাহাদের বুক কাঁপিতে ছিল; এইরূপে তাহারা নদীর ওপারে আসিয়া পৌঁছিল।

তীরে উঠিয়াই তাহাদের ফুর্তি আর দেখে কে? আগে যে অতো ভয় পাইয়াছিল তাহার চিহ্নই দেখা গেল না। মহা আনন্দে সকলে মিলিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল। নদী তো পার হওয়া গেল, এখন সবাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা তাহা তো দেখা চাই। আহম্মক সকলের পিছনে ছিল। সেই গুণিতে আরম্ভ করিল। সে নিজেকে বাদ দিয়া সকলকেই গুণিল। গুণিয়া তখন দেখিল মোট পাঁচজন হইল, তখন ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'হায় হায়, আমাদের মধ্যে একজন জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। গুরুমশায়, দেখুন, আমরা মোটে পাঁচটি এখন রয়েছি। গুরু তাড়াতাড়ি তাহাদের সকলকে সার দিয়া দাঁড় করাইয়া তিন চারবার গুণিয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনিও নিজেকে বাদ দিয়া গোণাতে ফল সেই পাঁচই দাঁড়াইল। তখন প্রত্যেকেই এক একবার গুণিয়া দেখিল, কিন্তু কেহই নিজেকে গুণিবার কথা ভাবিল না; কাজেই তাহারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিল যে, নদী তাহাদের একটিকে খাইয়া ফেলিয়াছে।

তখন তাঁহারা সকলে খুব চেঁচাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, নদী তুই পাষাণের চেয়েও কঠিন, বাঘের চেয়েও নিষ্ঠুর! আমাদের গুরু নিরেটকে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পৃথিবীর এধার থেকে ওধার পর্যন্ত তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর শিষ্যকে গিলে খেতে কি তোর একটুও ভয় হল না রে। তোর কি এত সাহস! তোর পরকালের কি গতি হবেরে! তুই কি এমন কাজ করবার পরেও বেঁচে

থাকবি ? তুই যেন একরার শুকিয়ে যাস, তোর ঢেউগুলো যেন পুড়ে যায়, তোর যেখানে জল ছিল, সেখানটা যেন কাঁটায় ভরে যায়।'

এই রকম করিয়া তাহারা খানিকক্ষণ হাত বাড়াইয়া, আঙুল মটকাইয়া নদীটাকে খুব অভিশাপ দিল। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে বুদ্ধিমানেরা, তাহাদের মধ্যে কে কে ডুবিয়া মরিয়াছে তাহার খোঁজ একবারও লইল না, চেঁচানোর দিকেই তখন তাহাদের মন। একটি লোক সেইখান দিয়া যাইতেছিল, সে তাহাদের কান্নাকাটি শুনিয়া দয়া করিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হে বাপু, ব্যাপার কী ? সবাই মিলে অতো গণ্ডগোল বাঁধিয়েছো কেন ?' ব্যাপারখানা যে কী তাহা সকলে খুলিয়া বলিল। লোকটি তাহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বলিল, যা হয়ে গিয়েছে তার আর কি করা যাবে ? কিন্তু তোমরা যদি আমাকে ভাল রকম বকসিশ দাও তাহলে আমি যে নদীতে ডুবে গিয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, কারণ আমার যাদু বিদ্যা খুব ভালো রকম জানা আছে! গুরু খুব খুশি হইয়া বলিলেন 'তুমি যদি তা করতে পার তাহলে আমরা আমাদের পথ খরচের জন্য যত টাকা এনেছি তোমাকে দেবো।' লোকটি তখন একটা লাঠি উঁচু করিয়া দেখাইয়া বলিল, আমার বিদ্যেটা এরি মধ্যে আছে। তোমরা সকলে সার দিয়ে দাঁড়াও। আর তোমাদেব পিঠে যেই লাঠি পড়বে, অমনি যদি প্রত্যেকে নিজের নাম বলে চেঁচিয়ে ওঠ, তাহলেই দেখবে যে তোমরা ছজনেই এখানে রয়েছ।' এই বলিয়া সে সকলকে সার দিয়া দাঁড় করাইল, এবং প্রথমেই গুরুর পিঠে ধাঁই করিয়া এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিল। গুরু চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'ওহে আমি হচ্ছি গুরু।' লোকটি বলিল, 'এক।' এই রকম করিয়া সে প্রত্যেককেই এক এক ঘা লাঠি লাগাইল, এবং তাহারা যেই আপন আপন নাম বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, অমনি গুণিয়া যাইতে লাগিল। শেষে তাহারা সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে ছজনই রহিয়াছে, একজনও বাদ পড়ে নাই। তখন তাহারা লোকটির যথেষ্ট প্রশংসা তো করিলই তার উপর থলি ঝাড়িয়া সব টাকাকড়ি দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

॥ সাপ খেলা ॥

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোথায়, শ্রীকান্ত ?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না ?

দিদির জন্যেই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ী।

এই তোমার দিদির বাড়ী ? এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান !

ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বল্‌ব। সাপ দেখাব, দেখবি শ্রীকান্ত ?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—তুমি সাপ খেলাবে কি ? কামড়ায় যদি ?

ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশী বাহির করিয়া আনিল এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আল্‌গা করিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম, ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখরো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না; শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখরো সাপই খেলাইবে; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখরো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রের হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্‌রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশীর লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে

গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালী করিয়া কহিল,—এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়।

ভয়ে, বিরক্তিতে, রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল ; বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে ? ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায় ?

ইন্দ্রের লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব ? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে ?

আমি বলিলাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে।

ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক্ ব্যাটাকে। বুনো সাপ ধ'রে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে দিদি! এসো না, এসো না ; ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো—

আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম—যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটি-বাঁধা কতকগুলি স্নুক্‌নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-শব্জী। পরণে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা-কাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দুস্থানীর মত সিঁদুরের আয়তিচিহ্ন। তিনি কাধের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি ?

ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেচে।

তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেচে, এ ত বড় আশ্চর্য। কি বল শ্রীকান্ত ? আমি অনিমেষ-দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—কিন্তু কি ক'রে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ ?

ইন্দ্র বলিল, ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েচে। একেবারে বুনো সাপ।

উনি ঘুমোচ্ছেন বুঝি ?

ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছে; চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও উঠবে না।

তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ-খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না? আচ্ছা, এসো, আমি ধ'রে দিচ্চি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহ্‌জীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া, ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি তাঁহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখ্‌খুনি ধ'রে দিচ্ছি ছাখ—! বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একমিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ইন্দ্র ঢিপ্‌ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে।

তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখ-দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

তিন আজগুবি

—বন্দে আলি মিয়া

সপ্ত ডিঙা মধুকর সাজিয়ে জানে-আলম বাণিজ্যে চললো। লতিফাবানু বাপের বাড়ীতে এসে বাপকে বললে, "আব্বা, আমিও বাণিজ্যে যাবো।"

কোটাল বল্লেন, 'মা তুমি মেয়েছেলে, তুমি বাণিজ্যে যাবে কেমন করে?'

লতিফাবানু বল্লে, "আমি সওদাগরের ছেলের বৌ—স্বামী গেছেন বাণিজ্যে, আমাকে সঙ্গে নেন নি, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গ নেব। আপনি আমার যাবার সব আয়োজন করে দিন।"

আদুরে মেয়ের আব্‌দার, বাপ আর কি করেন! বিশ্বাসী মাঝিমাল্লা ডেকে নৌকো সাজিয়ে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন।

তর্‌-তর্‌ করে পালভরে নৌকো ছুট্‌লো। এক রাত্তির পরে লতিফাবানু স্বামীর নৌকো দেখ্‌তে পেলে। লতিফা মাঝিমাল্লাকে ডেকে বলে দিলে, "ঐ যে নৌকো দেখতে পাচ্ছো, ওর পেছনে-পেছনে আমার নৌকো চালাবে—একটু দূরে-দূরে থেকো—ওরা যেন কেউ দেখ্‌তে না পায়!"

নদীর পর নদী যে কত গেল, তার আর শেষ নেই! এম্‌নি করে উজান বেয়ে যেতে-যেতে রাজার মুলুক ছেড়ে, তারা আর-এক রাজার মুলুকে এসে হাজির।

জানে-আলম সেই দেশের বাদ্‌শার বাড়ীর কাছে এসে নৌকা লাগালে।

সেই দেশের যিনি বাদ্‌শা—তিনি খুব বোজর্গ আর খুব নাম্‌দার। আদ্ধেক জাহানে তাঁর এলাকা। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে - মেয়েটি খুব সুন্দরী। মেয়ের বয়স হয়েছে—কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না ; কারণ, বাদশা পণ করেছেন, যে তাঁকে তিনটি আজগুবি শোনাতে পার্‌বে, তাকেই তিনি মেয়ে আর আদ্ধেক রাজত্ব দেবেন। কিন্তু যে শোনাতে পারবে না, তাকে আজীবন গারদে আটক হয়ে থাক্‌তে হবে।

আজগুবি অবশ্যি অনেকেই বলতে পারে! কিন্তু এ যেমন-তেমন আজগুবি নয়! বাদ্‌শা কথা শুনে যদি বলেন যে, এটা সত্যি-সত্যি আজগুবি, তবেই সেটা আজগুবি বলে মেনে নেওয়া হবে—নইলে নয়। কেউ এ পর্য্যন্ত এরকম আজগুবি বলে তাঁকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারে নি। তাই কত রাজা-বাদ্‌শার ছেলে যে গারদে আটক হয়ে আছে, তা গুণে শেষ করা যায় না।

কিন্তু জানে-আলম বাদ্‌শার পণের কথা শুনে ভাবলে—জীবনে তো কত আজগুবি কথা শুনেছি! তিনটে আজগুবি তাঁকে শোনাতে পারবো না?—খুব পারব। সে খুব সাজসজ্জা করে নৌকো থেকে নেমে গিয়ে রাজবাড়ীর ঢেঁড়ায় ঘা দিলে। আর অমনি পাইক এসে তাকে নিয়ে গেল বাদ্‌শার কাছে; কিন্তু, আজগুবি বল্‌তে এসে বল্‌তে পারলে না বলে—সে-ও গারদে আটক হয়ে রইলো।

লতিফাবানুও বাদ্‌শার পণের কথা শুনেছিল। স্বামী রাজবাড়ীতে গেলেন, কিন্তু দু'তিন দিনের ভেতর আর ফিরলেন না দেখে তাঁর ভাগ্যে যে কি ঘটেছে, তা বুঝতে তার বাকি রইল না। অনেক ভেবে চিন্তে সে পুরুষের পোষাক পরে ছদ্মবেশে নৌকা থেকে নেমে ঢেঁড়ায় ঘা দিলে। অমনি পাইক এসে তাকেও বাদ্‌শার কাছে নিয়ে গেল।

উজীর-নাজীর, পাত্র-মিত্রে সভা সরগরম! বাদশা পুরুষবেশী লতিফাবানুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বল্লেন, "অনেক রাজার ছেলে মিথ্যা আজগুবি কথা বল্‌তে এসে বল্‌তে না-পেরে গারদে আটক হয়ে

রয়েছে। তুমিও বল্‌তে পার্‌বে না—খামাখা কেন গারদে আটক হয়ে থাক্‌বে বাছা?—ফিরে যাও তোমার নিজের দেশে।"

লতিফাবানু শুনলে না, বললে, "এসেছি যখন, তখন আজগুবি না বলে ফিরব না। বল্‌তে না পারি, স্ব-ইচ্ছায় গারদে যাবো।"

বাদ্‌শা বললেন, "আচ্ছা,—তবে বলো।"

লতিফাবানু বল্‌তে আরম্ভ করলে: "বাদ্‌শা নাম্‌দার! সুমেরুতে আমার বাড়ী। আপনার পিতা সেখানে বেড়াতে গিয়ে আমার কাছ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে একটা কানাকড়ি ধার করেছিলেন, সেই কড়ি সুদে-আসলে এখন দু'লাখ হয়েছে। টাকাটা এখন আমাকে দেবার হুকুম হোক্‌।"

বাদশা পড়লেন মহা ফাঁপরে। যদি কথাটা আজগুবি বলে স্বীকার না করেন, তবে দু'লাখ টাকা তাঁকে এখনি দিতে হয়। তাই আমতা-আমতা করে তিনি বল্লেন, "তোমার তো দেখছি নেহাত কাঁচা বয়স। ষাট বৎসর আগে তুমি নিশ্চয় জন্মাও নি। তাছাড়া, আমার বাবাও বাদশা ছিলেন, কাণাকড়ি তিনি ধার করলেন কিসের জন্যে?"

লতিফাবানু হাসিমুখে কুর্নিশ করে বল্‌লে, "বাদ্‌শা নাম্‌দার! তাহলে বলুন—আমি একটা আজগুবি বল্‌তে পেরেছি!"

সভার লোকেরা সবাই অবাক্‌। বাদ্‌শা ভাবলেন, তাইত, এ যে সত্যি-সত্যিই একটা আজগুবি স্বীকার করিয়ে নিলে! যাই হোক্‌, আরো তো দুটো বাকি আছে। এবার বিশেষ সাবধান হয়ে কথা শুনতে হবে।

পরদিন ভোর হলে আবার সভা বস্‌লো।

লতিফাবানু সকলকে সেলাম-তস্‌লিম জানিয়ে বলা সুরু কর্‌লে: "সাহানসা বাদ্‌শা নাম্‌দার! গোলামের কসুর মাফ করবেন। ধরুন—আপনার বাড়ীতে একটা মস্ত ভোজ হবে। মোটে হাজার-পাঁচেক ছাগলের যোগাড় আছে। কাজের দিন হিসেব করে দেখলেন, তাতে কুলোবে না; আপনার আরো লাখ-চারেক ছাগলের দরকার। একদিনে তা কি ক'রে যোগাড় করবেন?"

বাদ্‌শা বল্‌লেন, "আমার লোক বাড়ী-বাড়ী গিয়ে ছাগল কিনে নিয়ে আস্‌বে। কিন্তু একদিনে পাঁচ হাজার, কি বড় জোর দশ হাজার যোগাড় করা যায়; একেধারে চার লাখ—অসম্ভব!"

লতিফাবানু বললে, "বাদ্‌শা নামদার! আমাদের দেশে কিন্তু ছাগল যোগাড় করবার সুন্দর একটা উপায় আছে। পাঁচ হাজার ছাগল জবাই করবার পর, যদি দেখা যায় যে, আরো চার লাখ ছাগলের দরকার, তাহ্‌লে লোকের বাড়ী-বাড়ী সিপাই-বরকন্দাজ কিছুই পাঠাতে হয় না।—সেই পাঁচ হাজার ছাগলের তো মুণ্ডুগুলো রইলো, তাই মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। বাস্‌, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফি মাথায় আণ্ডটা করে ছাগল গজায়। চার লাখ ছাগল পেতে আর কতক্ষণ!"

বাদশা হো-হো করে হেসে বললেন, "ছাগলের মাথায় কখনো ছাগল গজায়?—এ নেহাৎ অসম্ভব গাঁজাখুরি!"

লতিফাবানু বাদশাকে দু'হাতে সেলাম করে বল্‌লে, "বাদশা নাম্‌দার! দোয়া করুন! তাহ্‌লে আমার দুটো আজগুবি বলা হলো?"

সভার সকলে লোকটির বুদ্ধির খুব তারিফ করতে লাগলো। বাদশা দেখ্‌লেন, এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটি গল্প বলে তাঁকে বেহুঁস করে কাজ হাসিল করে নিয়েছে। এ ছেলেটি ত কম চালাক নয়! তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, পরদিন আরো হুঁসিয়ার হয়ে তার কথা শুনবেন। সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ করে তিনি গম্ভীর মুখে অন্দরে চলে গেলেন।

পরদিনেও আবার তেমনি সভা বসলো।

আজ শেষ দিন—সকলেই ছেলেটির জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করছে, সে যেন পণে জিত্‌তে পারে, তার যেন শাস্তি না হয়।

লতিফাবানু সকলকে সেলাম জানিয়ে বল্‌তে আরম্ভ করলে: "বাদশা নাম্‌দার! আপনাদের দেশে বোশেখ-জ্যৈষ্ঠমাসে খুব রোদ হয়—গরমে লোক ছট্‌ফট্‌ করে—রোদের তাতে মাটি ফেটে যায়, তখন খোলা মাঠে চাষারা কাজ করে কি করে?"

বাদ্‌শা বললেন, "কেন, কেউ মাথায় গামছা বেঁধে, আবার কেউ-কেউ বা টোকা মাথায় দিয়ে কাজ চালায়।"

লতিফা বললে, "তাতে চাষার মাথাটা না হয় বাঁচ্‌লো, কিন্তু গরুর কি দশা ?"

বাদশা বল্‌লেন, "তার আর কোনো উপায়ই নেই।"

লতিফা বল্‌লে, "উপায় নেই ? খুব উপায় আছে। আমি উত্তরদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, চাষারা ভারি এক মজার কাণ্ড করে। কি করে জানেন ? বাছুর জন্মালেই—যেগুলো চাষের কাজে লাগবে,—সেগুলোর পিঠে তারা অশ্বত্থ-বীজ বুনে দেয়। বাছুর-গুলোও বড় হতে থাকে—গাছও তাদের পিঠের ওপরে বাড়তে থাকে। তারপর সেগুলো যখন কাজের যুগ্যি হয়—গাছগুলোও তখন ডালপালা মেলে খুব বড় হয়ে ওঠে। ক্ষেতে চাষ করবার সময় রোদে আর তাদের কোনো কষ্টই পেতে হয় না।"

বাদশা বল্‌লেন, "গরুর পিঠের ওপর মাটি কোথায় যে, গাছ জন্মাবে ?—আর যদিই বা জন্মায়, পিঠের গাছপালা নিয়ে তারা গোয়ালে থাকে কি করে ?—এ একেবারে নেহাৎ আজগুবি—মিথ্যে—"

লতিফাবানু বাদশাকে সেলাম করে বল্‌লে, "বাদশা নাম্‌দার! এবার তাহলে আমার তিনটে আজগুবিই বলা শেষ হলো!"

বাদশা তাকে দেখে যেমন খুশী হয়েছিলেন, তার বুদ্ধির কৌশল দেখেও তেমনি খুশী হলেন। সভার লোকেরাও তার বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলো।

রুক্মিনী দেবীর খড়্গ

—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়ত খুঁজিতে জানিলে তাহাদের সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়ত আমাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না। শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মত সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহা আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতি-প্রাকৃত বলা হয়।
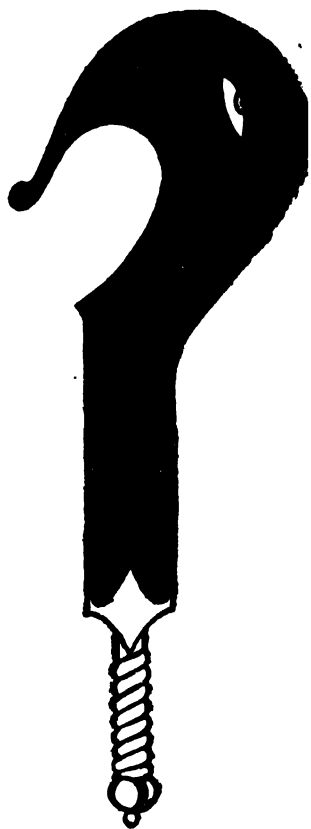
আমার জীবনে একবার এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল, যাহার যুক্তিযুক্ত কারণ তখন বা আজ কোন দিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস, তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোন স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দলাভ করিব।

ঘটনাটি এইবার বলি।

কয়েক বছর আগের কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাষ্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাংলাদেশের একঘেয়ে সমতল ভূমির কোন পল্লী আর চোখে ভাল লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বিভাবে সারা গ্রামের বাড়িগুলি অবস্থিত। সর্বশেষ সারির বাড়ীগুলির খিড়কির দরজা খুললেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুর্চি বিশ্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল ; একটি সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদী, ছোট বড় শিলাখণ্ড ও ভেলা-কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথমে ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙ্গা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমের বাঙালী। একটা কথা—চেরো গ্রামের বেশিরভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে। অনেকে বাংলা আচার ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ির দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মত ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিতক্ত ও বিগ্রহ শূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালের পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়, অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল এ কথা তারপর বাড়ি ফিরিয়া

অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম মন্দিরটি ভাল করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল—যাবেন না স্যর ওদিকে।

—কেন?

—জায়গাটা ভাল না। সাপের ভয় আছে সন্ধেবেলা। তাছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয় ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।

—ওটা কি মন্দির?

—ওটা রুক্মিনী দেবীর মন্দির, স্যর। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনদিন ওখানে পুজো হতে দেখিনি—মূর্তিও নেই বহুকাল! ঐ রকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ ঠাকুরদার আমলেরও আগে।…চলুন স্যর নামি।

ছেলেটা যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করতে লাগল নামিবার জন্য। রুক্মিনীদেবী বা তাঁহার মন্দির সম্বন্ধে দু একজন বৃদ্ধলোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রুক্মিনীদেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতে তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম। বছর-খানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজ-কর্ম খুব হালকা, অবসর সময়ে এ গ্রামে ও গ্রামে বেড়াইয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেক দিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি, এন, আর, লাইনের একটা ছোট ষ্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটা ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূম

প্রবাসী উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আনন্দ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট পুঁথি সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টারও। এদেশে প্রচলিত কতরকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের, কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এইসব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ পোষ্ট মাষ্টারের বাড়িতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এইসব অরণ্য অঞ্চল সভ্য জগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত ; এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায় শালবন বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি। কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন—চেরো পাহাড়ের রঙ্কিনী দেবীর মন্দির দেখেছেন ?

আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম। রঙ্কিনীদেবী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আর কোন কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম—মন্দির দেখেছি, কিন্তু রঙ্কিনী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিজ্ঞেস করেছি, সেই চুপ করে গিয়েছে কিংবা অন্য কথা পেড়েছে।

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন—রঙ্কিনী দেবীর নামে সবাই ভয় পায়।

—কেন বলুন তো ?

—মানভূম জেলার আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করত। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিনীদেবী হিন্দুদের দেবীর মত নয়। অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর। আগে ঐ মন্দিরে নরবলি হত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিনী মন্দিরে নরবলি হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিনীদেবী অসন্তুষ্ট হলে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহলে। এরকম অনেকবার হয়েছে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিনী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।

—রঙ্কিনী দেবীর বিগ্রহ, দেখেছিলেন মন্দিরে ?

—না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখেছি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়, অন্য কোন দেশে। রঙ্কিনী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ি ছিল এই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তাঁর বাড়ি অনেকবার গিয়েছি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি, এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তারপর চেরো গ্রামেই আর বহুদিন যাইনি—বয়স হয়েছে, বড় বেশি কোথাও বেরোই নে।

—বিগ্রহের মূর্তি কি ?

—শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকত অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েছে তার লেখা জোখা নেই—এখনো মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিবি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।

সাধে এ দেশের লোক ভয় পায়। শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়-চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছম-ছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত

ভাল লাগিয়াছিল যে হয়ত সেখানে আরও অনেক দিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালীদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্য বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবি করিতে লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজীর মাষ্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজী পড়াইতাম—মাঝ হইতে আমার চাকুরী রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটা হাইস্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল; ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাষ্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এমন সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কি কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুর গাড়িসমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়িতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও আমার বাসায় আসেন নাই। বাড়িতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের স্থরে বলিলেন—এই বাড়িতে থাকেন আপনি?

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ি তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছরখানেক হল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন্ এটা ঠিক করে দিয়েছেন।

পুরানো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটা যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ির একটু চুনবালি খসাইতে পারিবেনা। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়িটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়িটার

গড়ন তাঁহার ভাল লাগিয়াছে। বলিলাম—সেকালের গড়ন, খুব টন্‌কো—আগা গোড়া পাথরের—

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন—না সেজন্য নয়। আমি এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম। এই বাড়িই হল রুক্মিনীদেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এ বাড়িতে আছেন তা জানতাম না। তা বেশ, বেশ। অনেকদিন পরে বাড়িতে ঢুকলাম কিনা, বড় অদ্ভুত লাগছে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, এখন প্রায় ষাট।

তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গরুর গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই। কারণ এখানকার বাঙ্গালী মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে। আপাতত আমার চাকরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক, বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখোহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই বলিয়া উঠিল—এঃ, এ কিসের রক্ত। দেখুন—

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে। বাহিরে দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধাপ উঠান বহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক! কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল? আজ দু তিন দিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ির ভিতরে উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এ ক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম—দেখ তো রে, রক্তটা কোন দিকে যাচ্ছে—এ সেই হুলো বিড়ালটির কাজ···

রক্তের ধারা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নীচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোড়া পুরানো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোন দিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালাবন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্র-পথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরানো, ভাঙা তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরানো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচা ধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখোহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিল—একি বাবু! এ দিকে কি করে এমনধারা রক্ত লাগল।

তারপর সে কি একটা জিনিষ হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দেখুন কাণ্ডটা বাবু···জিনিষটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচা-ধরা হাতল-বিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রামদা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাহার রক্তে টক্‌টকে রাংগা! একটু একটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত

মাখানো। মনে হয় যেন খাঁড়া খানা হইতে টপ্‌টপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে।

সেই মুহূর্তে এক সংগে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রঙ্কিনী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ি এটা। পুরানো জিনিষের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রঙ্কিনী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়া ছিল হয়তো।...মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ায় প্রবাদ। আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।—

বাড়তি মাশুল

—বনফুল

একেই বলে বিড়ম্বনা।

আমি একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। সেদিন সমস্ত দিন আফিসে কলম পিষে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেণের একখানি থার্ড ক্লাসে বসে হাঁপাচ্ছি—এমন সময় দেখি সামনের প্লাটফর্ম থেকে বোম্বে মেল ছাড়ছে আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ আমার চোখে পড়ে গেল যাতে আমার সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে উঠল।

বহুদিন আগে আমার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যায়—আর ফেরে নি। অনেক খোঁজ-খবর করেছিলাম, কিছুতেই কিছু হয়নি। ভগবানের ইচ্ছা বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তারই মুখখানি—হ্যাঁ ঠিক সেই মুখটিই বম্বে মেলের একটা কামরায় দেখতে পেলাম।

আর কি থাকতে পারি?

তাড়াতাড়ি গিয়ে বম্বে মেলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেলও ছেড়ে দিলে। ট্রেণে উঠে আবার ভাল করে দেখলাম—হ্যাঁ ঠিক সেই—পাশে একটি বৃদ্ধও বসে আছেন।

ভয়ে ভয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, "এতদিন কোথায় ছিলি—আমাকে চিনতে পারিস্?"

হা ঈশ্বর—সে উত্তর দিলে হিন্দীতে। "হামারা নাম পুঁছতে হেঁ? কেউ? হামারা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা!" সমস্ত মনটা যেন ভেঙ্গে গেল—মনে হল যেন দ্বিতীয়বার আমি পুত্রহারা হলাম।

বৃদ্ধটি বললেন—"হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজি, আপ কেয়া মাঙ্‌তে হেঁ!"

রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—"কিছু না!"

বেহারী ছাপরাবাসী পিতাপুত্রকে বিস্মিত করে দু-ফোঁটা চোখের জলও আমার শুষ্ক শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

বর্দ্ধমানে নামলাম।

আবার **Excess fare** বাড়তি মাশুল দিতে হল।

কীচক বধে ঘনাদা

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

উপমাটা কী দেব ভেবে পাচ্ছি না।

আহ্লাদে আটখানা হয়েই বোধ হয় কথা যোগাচ্ছে না মাথায়। তাই বেড়ালের শিকে ছেঁড়া, না মরা গাঙে বান ডাকা, কোনটা জুতসই হবে ঠিক করতে দেরি হচ্ছে।

যাক্, গুলি মারো উপমায়! আসল কথাটা শোনালেই যখন নেচে উঠতে হবে, তখন উপমার কী দরকার? আর নেহাত যদি উপমা না দিলে মান থাকে না মনে হয়, তাহলে র‍্যাশনে যে মিহি চাল পুরা দিয়েছে বলতে দোষ কী?

ব্যাপারটা অবশ্য র‍্যাশনে মিহি চাল পাওয়ার চেয়েও খুশিতে ডগমগ করবার। বাহাত্তর নম্বরের তাই প্রায় সবাই হাজির টঙের ঘরে।

বাহাত্তর নম্বর বলতেই রহস্যটা বোঝা গেছে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, অনুমানটা কারুরই ভুল নয়। ঘনাদা সত্যিই সদয় হয়েছেন।

আবহাওয়ার এই অভাবিত পরিবর্তনটা সকালবেলাতেই টের পেয়েছি। বেশ একটু ভয়ে ভয়েই গৌর আর আমি সকালবেলা একবার হালচালটা বুঝে নিতে টহলদারিতে এসেছিলাম। ক'দিন ধরে যা খরা যাচ্ছে তাতে বৃষ্টি তো বৃষ্টি, একটু মেঘের টুকরোও দেখবার আশা অবশ্য করিনি।

কিন্তু ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘর পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই বুকগুলো দুলে উঠেছিল। না, বৃষ্টি তখনো না পড়ুক, আকাশ যাকে বলে মেঘমেদুর। ধান একটু মাপতে না মাপতেই ঝেঁপে নেমে আসবে মনে হয়।

ঘনাদা ঘরের মধ্যে অন্যদিনের মতো তাঁর জগদ্দল কাশীরাম দাসে মুখ গুঁজে বসে নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের ওপরেই পায়চারি করছেন।

ঘনাদার ছাদে পায়চারি! এমন দৃশ্য আগে তো কখনো কেউ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ পায়চারির অর্থ কী? আর লক্ষণটা শুভ, না অশুভ? কিছুই ঠিক বুঝতে না পেরে একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা করেছি—হয়েছে কী ঘনাদা?

হয়েছে?—যেতে যেতে ঘনাদা ফিরে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যস! ওই ফেরাটুকুতেই যা বোঝবার আমরা বুঝে নিয়েছি। বুক আমাদের তখনই দশ হাত।

যেটুকু ধন্দ ছিল, ঘনাদার পূরণ করা বাক্যাংশেই তা দূর হয়ে গিয়েছে।

না হয়নি তো কিছু ?—ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর কথাটা শেষ করেছেন ঘনাদা—একটু যুদ্ধের কথা ভাবছিলাম।

যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন ঘনাদা !

শুনেই 'কেল্লা ফতে !' বলে চিৎকার যে করিনি, সে আমাদের কঠোর আত্মসংযম।

মনে মনে অদ্ভুত ব্যাপারগুলো শুধু একবার ভেবে নিয়েছি। এ পর্যন্ত যা দেখলাম শুনলাম, সবই তো হিসেবের বাইরে।

ঘনাদা সাত-সকালে ছাদের ওপর পায়চারি করছেন।

আমাদের ডাকে তিনি ফিরে দাঁড়িয়েছেন ও তখন তাঁর মুখের পেশীর কুঞ্চনে যে ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে প্রসন্ন হাসি বললে মানহানির দায়ে বোধ হয় পড়তে হয় না।

সবচেয়ে মোক্ষম কথা হল এই যে, ঘনাদা প্রত্যুষের পদচারণার সঙ্গে যুদ্ধের কথা ভাবছেন বলে নিজমুখে স্বীকার করেছেন।

এর পর আর আমাদের পায় কে !

নেহাত ওপরে আসবার ছুতো হিসেবে বিকেলের মেনুটা একটু আলোচনা করেই নিচে নেমে গেছি তৈরী হয়ে আসবার জন্যে।

যুদ্ধের কথা ভাবছেন ঘনাদা। সুতরাং জঙ্গী দপ্তরের সব বিভাগেই খবর চলে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ ! বনোয়ারী চলে গেছে গরম জিলেবীর দোকানে, রামভুজ কড়া চাপিয়েছে নিজেদের হেঁসেলেই কচৌরী ভাজবার জন্যে।

আর আমরা ঠিকমতো তোড়জোড় করে সদলবলে গিয়ে হাজির হয়েছি টঙের ঘরে। উপস্থিতিটা ঠিক সময়েই ঘটেছে। ছাদের পায়চারি শেষ করে ঘনাদা ঘরে এসে তাঁর নিজস্ব চৌকিতে বসে বসে গড়গড়ায় দু-একটি টান মাত্র দিয়েছেন।

যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন ঘনাদা ?—গৌর চৌকাঠে পা দিয়েই শুরু করেছে—যুদ্ধের সেরা কিন্তু মল্লযুদ্ধ, শুনলেই গা গরম হয়ে ওঠে।

গরম হয়ে ওঠার প্রমাণ হিসেবে গৌর আবৃত্তি শুরু করতেও দেরি করেনি—

মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন॥
তথাপি বিক্রমে ভীম হইতে নহে উন।
পদাঘাত দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ॥
আঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে জড়াজড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জর অঙ্গ পদাঘাতে নখে॥

গৌর আরও খানিক আবৃত্তি চালিয়ে যেতে পারতো বোধ হয়। কিন্তু ঘনাদার মুখের দিকে চেয়েই তাকে একটু দ্বিধাভরে থামতে হল।

তখন আমাদেরও বুকে একটু ধুকপুকুনি শুরু হয়েছে।

এই খানিক আগে যেখানে অমন অনুকূল বাতাস বইছিল, সেখানে হঠাৎ একটু গুমোটের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি?

ঘনাদা গড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে যেন টানতে ভুলে গেছেন। ভাতের গ্রাস মুখে দিতে দাঁতে যেন একটু বালি পেয়েছেন এমনি মুখের ভাব।

মনে মনে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

এমন সুদিনে কোন্‌খানে পান থেকে চুন খসল বুঝতে না পেরে শিশির তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে বললে, তামাকটা বুঝি ঠিক জুতসই হয়নি আজ?

ঘনাদা শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটের দিকে দৃক্‌পাতও করলেন না। সেই ঈষৎ বালি-চেবানো মুখের ভাব নিয়ে কোন্ সুদূর ভাবনায় যেন মগ্ন হয়ে অন্যমনস্কভাবে, বললেন—না, ভুল।

ভুল! আমরা তো তাজ্জব! ভুলটা কোথায়? তামাক সাজায়?

নিজেদের বুদ্ধির দৌড় মাফিক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তামাকটা আর একবার সাজিয়ে দেব ঘনাদা ?

না, ভুল তামাক সাজায় নয়,—ঘনাদা গড়গড়ার নলে দু-তিনটে চটপট টান দিয়েই বুঝিয়ে বললেন,—ভুল ওই লড়াই-এর বর্ণনায়।

লড়াই-এর বর্ণনায় ভুল !—ক'দিন ধরে লাইনগুলো মুখস্থ করেছে বলে গৌর বেশ ক্ষুণ্ণ—কিন্তু কাশীরাম দাসের খাঁটি সংস্করণ থেকে তুলে এনেছি।

তাছাড়া—আমিও এবার একটু মদৎ দিলাম গৌরকে—কালী সিংহীর আদি মহাভারতের অনুবাদেও তো ওই রকম আছে।

যা আছে তা ভুল।—যেন নিতান্ত আফসোসের সঙ্গে জানালেন ঘনাদা,—আসলটা পাওয়া যায়নি বলে অমনি করে গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে।

—আসলটা পায়নি ?

—মূল মহাভারতেও গোঁজামিল ?

—কীচক-ভীমের অমন জবর যুদ্ধটার বর্ণনাও বেঠিক ?

আমাদের চোখগুলো কপালে ওঠার সঙ্গে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাগুলো ভেতরে আর চাপা রাখা গেল না।

তার অমন আবৃত্তিটা মাঠে মারা যাওয়ার জন্যে গৌরের মেজাজটাই সবচেয়ে খারাপ। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলাতেই সে জিজ্ঞাসা করলে—আসলটা কী ছিল কী ?

কী ছিল ?—ঘনাদা একটু জীবে দয়া গোছের মুখের ভাব করে বললেন—ছিল সত্যিকার একটা নিযুদ্ধের বিবরণ।

নিযুদ্ধ ! সে আবার কী ?

প্রশ্নটা আমাদের মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই ঘনাদা অবশ্য নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন—নিযুদ্ধ মানে বিনা অস্ত্রে লড়াই। তখনকার দিনের শাস্ত্রীয় মল্লযুদ্ধের ওই ছিল আরেক নাম। আর ভীমসেন কীচকের সঙ্গে শাস্ত্রমতেই লড়েছিলেন।

—শাস্ত্রমতে লড়েছেন ভীমসেন ! তবে যে… ?

ওই তবে যে···টুকুই ফাঁকি।—আমাদের বাধা দিয়ে বিবৃত করলেন ঘনাদা,—ভীমসেনের অন্য যা দোষই থাক রাজাগজার মানের জ্ঞান টনটনে। তাই সে মহলের আদব-কায়দা সম্বন্ধে খুবই হুঁশিয়ার। জংলী বলে ধরে হিড়িম্বের সঙ্গে যেভাবে যুদ্ধ করেছেন, কীচকের বেলা তা ভাবতেও পারেন না। যত বড় পাপিষ্ঠই হোক, কীচক রাজাগজাদেরই তো একজন। বিরাট রাজার সম্বন্ধী, তার ওপর আবার মৎস্য দেশের সেনাপতি। তাই তাকে মোক্ষম শিক্ষা দিতে গিয়েও শাস্ত্রের বাইরে ভীমসেন যাননি।

শাস্ত্রমতে আসল নিযুদ্ধটা কি রকম হয়েছিল শুনি! —গৌরের গলায় বেশ ছুঁচোল সন্দেহ।

শুনবে? শোনো তাহলে।—ঘনাদা চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখার ধারাবিবরণী দিতে শুরু করলেন—শাস্ত্রমত নমস্কার আর হাত নেওয়ার পর কীচক করল কক্ষাস্ফোটন আর ভীমসেন স্কন্ধতাড়ন। এবার দুজনে কক্ষাবন্ধ হয়েছে। ওই কীচক ভীমসেনকে পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ করছে। ভীমসেন টলছে, টলছে, চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখছে, পড়ে যাচ্ছে কাটা কলা গাছের মতো। ওই পড়ছে, পড়ছে, পড়ল,—না, না, পড়েনি। পড়তে পড়তে ভীমসেন সামলে বহিকণ্টক লাগিয়েছে। গেল গেল, কীচক বুঝি জরাসন্ধ হয়ে গেল, চিড় খাচ্ছে, খাচ্ছে,—না, ভীমসেনের কৃত-এর পর কৃতমোচন করেছে কীচক, সুসঙ্কট দিয়ে সন্নিপাত করে অবধূত করেছে ভীমসেনকে···

—দোহাই। দোহাই ঘনাদা! একটু থামুন!

সবাই মিলে আর্তনাদ করেই ঘনাদাকে থামাতে হল। 'কক্ষা-স্ফোটন' 'স্কন্ধতাড়ন' থেকে 'কক্ষাবন্ধ', 'পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ' পর্যন্ত কোনো রকমে সহ্য করা গেছল, কিন্তু 'বাহুকণ্টক' থেকে 'কৃত', 'কৃতমোচন' হয়ে 'সুসঙ্কট', 'সন্নিপাত' ছাড়িয়ে 'অবধূত'-এ পৌঁছোবার পর আমাদেরই অবস্থা কাহিল। চরকিপাক লাগা মাথায় তাই প্রায়

খাবি খাওয়া গলায় বলতে হল,—বনোয়ারীকে দিয়ে ক'টা অ্যাসপিরিন আগে আনিয়ে নিই।

ওঃ—ঘনাদা অনুকম্পায় কোমল হলেন,—মাথায় কিছু ঢুকছে না বুঝি! আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসব হল সেকালের আখড়াই বুলি। বিরাটপুরীর জিমূত পালোয়ানের আখড়া ছিল সবচেয়ে নামকরা। নিযুদ্ধের বুলি সেখান থেকেই বেশীর ভাগ আমদানী। 'কক্ষাস্ফোটন' আর 'স্কন্ধতাড়ন' হল লড়াইয়ের আগে মল্লদের হাতপা নেড়ে যাকে বলে গা-গরম করা—'কক্ষাবন্ধ' হল লড়াইয়ের প্রথম জাপটাজাপটি মানে আলিঙ্গন। 'পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ' হল দুহাতেই আঙুল শক্ত করে শত্রুর মাথায় চাঁটি! এক পা চেপে ধরে আরেক পা টেনে ছেঁড়ার নাম 'বাহুকণ্টক।' শত্রুকে মারের প্যাঁচ হল 'কৃত', আর সে প্যাঁচ ছাড়ানো মানে কৃতমোচন হল 'প্রতিকৃত'। শক্ত ঘুষি-পাকানো হল 'সুসঙ্কট', আর তার কাজ হল 'সন্নিপাত'। 'অবধূত' হল শত্রুকে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

ঘনাদার এ ব্যাখ্যায় মাথা ঘোরা বন্ধ না হলেও ভীমসেনকে 'অবধূত' করার খবরে বেশ একটু বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল—স্বয়ং ভীমসেনকে 'অবধূত' মানে দূরে ছুঁড়ে ফেললে কীচক?

তা তো ফেললেই।—ঘনাদা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে যেন বাধ্য হলেন—শুধু কি অবধূত? মাটিতে ফেলে তারপর যা 'প্রমাথ' মানে দলাইমলাই দিতে লাগল তাতে মনে হল, ভীমসেনের হাড়গোড়ই বুঝি গুঁড়ো হয়ে যায়। 'প্রমাথ'তেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভীমসেনকে তুলে ধরে 'উন্মথন' মানে পেষাই দিতে লাগল কীচক।

ঘনাদা এমন একটা মহাসঙ্কটের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যেই একটু থামলেন। তারপর ত্রিকালদর্শী 'টেলিফটো লেন্স'টা যেন ঠিক 'ফোকাস' করে নিয়ে চাক্ষুষ ধারাবিবরণীতে মেতে উঠলেন আবার—এখনো উন্মথিত করছে কীচক। কী হল কী ভীমসেনের? সাড় নেই নাকি শরীরে? কীচক তো এবার প্রাণের সুখে 'প্রসৃষ্ট' মানে আলগা হাতের চাপড় লাগাচ্ছে। এর পর তো 'বরাহোদ্ধতনিঃস্বন'

মানে কাঁধে তুলে মাথা নীচে ঝুলিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে দূরে আছড়ে মারবে। তাহলেই তো খেল খতম।

নাচঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী ভয়ে কাঁপছেন। কাঁপছেন অলক্ষ্যে বিনা টিকিটে যাঁরা লড়াই দেখতে এসেছেন সেই ছোট-বড় দেবতারা। ভীমসেনের রুস্তম-ই-হিন্দ থুড়ি ভারত-মাতঙ্গ খেতাব বুঝি যায়, ভীমসেন বুঝি মহাভারত ডোবায়। ন-ন্-ন্-ন্—না—। ওই ত 'শলাকা' মানে, সোজা লোহার মতো শক্ত এক আঙুলের খোঁচা লাগিয়েছে ভীমসেন। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ভীমসেনকে কাঁধ থেকে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে কীচক। মাটিতে পড়েই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে ভীমসেন। ভীমসেন না, মত্ত মাতঙ্গ। কীচকের চারিধারে 'অভ্যাকর্ষ' অর্থাৎ বাগে পাবার মৌকা পেতে পাক দিয়ে ফিরছে ভীমসেন। এই আচমকা 'অবঘট্টন' মানে হাঁটু আর মাথার গুঁতো কীচকের বুকে আর পেটে। তারপর আকর্ষণ, মাটিতে ফেলে বিকর্ষণ, কোলে তুলে হাত-পা দুমড়ে প্রকর্ষণ আর সর্বশেষে প্রাণ-হরণ।

ঘনাদা থামলেন। আমরা অভিভূত স্বরে বললাম, এই তাহলে কীচক-বধের আসল বৃত্তান্ত। কিন্তু এতে তো ভীমসেনের লজ্জার কিছু নেই। যা আছে বরং যুদ্ধ হিসেবে গৌরবের। সুতরাং এসব কথা মহাভারত থেকে লোপাট করার দরকারটা কী ছিল ?

কিছুই ছিল না। ঘনাদা যেন মুখখানা তেতো করে বললেন, —ওই দুটো বোকা ফালতু ভাইয়ের দোষেই এই হিতে বিপরীত।

বোকা ফালতু ভাইদুটো মানে নকুল-সহদেব বুঝলাম। কিন্তু তাদের বুদ্ধির দোষটা কী, আর তাতে হিতে বিপরীতটা কিরকম ?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম ঘনাদাকে।

কিরকম তা বলতেও মেজাজ খিচড়ে যায়। ঘনাদা যেন আমাদের কাছেই সাড়ে তিনহাজার বছরের জমানো গা-জ্বালাটা প্রকাশ করলেন—দুই হাঁদা ভাইয়ের মাথায় হঠাৎ বাই চাপল আদি পর্ব থেকে

জতুগৃহদাহ অধ্যায়টা একটু ছাঁটাই করতে হবে। মানে কুন্তী মায়ের নামে কোন নিন্দে যেন কখনো না উঠতে পারে।

কুন্তী মায়ের নামে নিন্দে উঠবে কেন ?—আমরা অবাক,—জতুগৃহ পোড়াবার প্ল্যান তো দুর্যোধনের হুকুমে পুরোচনের!

তা ঠিক।—ঘনাদা আমাদের জ্ঞান দিলেন—কিন্তু আসলে ও মোম-গলার ঘরে আগুন দিয়েছিল তো ভীমসেন, আর ছেলেদের সঙ্গে লুকিয়ে কাটা সুরঙ্গ দিয়ে পালাবার আগে কুন্তী দেবীর একটা দারুণ অন্যায় হয়েছিল।

কুন্তী দেবীর আবার কী অন্যায় ? —আমরা বিমূঢ়।

অন্যায় পালাবার আগে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নামে ভুরিভোজের ব্যবস্থা।—ঘনাদা কুন্তীদেবীর সমালোচনায়, না সেই সুদূর ভুরি-ভোজের গন্ধে নাক কুঁচকোলেন, ঠিক বোঝা গেল না—যে এসেছে তাকেই গাণ্ডেপিণ্ডে খাইয়ে একেবারে অচল করে দিয়েছেন। সেই নিষাদ মা আর তার পাঁচ ছেলে ওই ফাঁসির খাওয়া খেয়েই না পেট ঢাক হয়ে অমন বেহুঁশ হয়েছিল। নিজেরা পালাবার সময় ওই মা-ছেলেদের জাগিয়ে দিয়ে সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল না কুন্তী দেবীর? এসব কথা কেউ যাতে আর না তুলতে পারে, নকুল-সহদেব তাই কুন্তী দেবীর ভোজ দেবার ব্যাপারটাই বাদ দিতে চেয়েছিল মহাভারত থেকে।

কিন্তু সে সব কথা তো মহাভারতে জ্বল্‌জ্বল্ করছে এখনো।—আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ও দুই হাঁদা ভাই আসল জায়গায় মানে দারুক-মূষিক এজেন্সীতে যায়নি বুঝি? সেখানে গেলে তো গণেশের বাহন-বাহাদুর কবে বেমালুম সব কেটে উড়িয়ে দিত।

হাঁদা হোক, ফালতু হোক, যমজ দুভাই সে কথা কি আর জানত না!—ঘনাদা নকুল-সহদেবের হয়ে একটু বললেন—ভীমদাদা আর পুরুত মশাই ধৌম্য ঠাকুরের কাছে একটু আঁচ পেয়েই তো তারা মতলবটা ভেঁজেছিল। কিন্তু তারা যখন খোঁজ করতে গেছে, তখন

ইন্দ্রপ্রস্থের চোরাগলিতে সব ভোঁ ভোঁ। দারুক-মূষিক কোম্পানী লালবাতি জ্বেলে গণেশ উল্টে পালিয়েছে।

দারুক-মূষিক এজেন্সী ফেল!—আমরা যেমন বিস্মিত তেমনি একটু হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

কেন আর!—ঘনাদা তথ্যটা জানালেন,—গণেশঠাকুরের বাহনটি ঘুষ খেয়ে খেয়ে শুয়োরের মতো এইসা মোটকা তখন হয়েছে যে, পুঁথিঘরের গর্ত দিয়ে গলতেই পারে না। ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক বাবাজির পেছনেও তখন খাজাঞ্চী দপ্তরের চর লেগেছে। সব দিক দিয়ে বেগতিক বুঝে দ্বারকাতে গিয়ে ডুব মেরেছেন তাই।

দারুক-মূষিকের খোঁজ না পেয়ে দুই হাঁদা ভাই যখন দিশেহারা, তখন একদিন দুপুরে শোনে তাঁদের রাজড়াপাড়ার রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে,—'কান কটকট, দাঁতের দরদ, ছাতা-জুতো সারাই, উই লাগাই উই ধ—রা—ই।'

ছাতা-জুতো-জামা-কাপড় সারানোর কথা তো জানা, দাঁতের-কানের ব্যথা সারানোও নতুন নয়। কিন্তু উই লাগানো, উই ধরানো আবার কী!

'ডাক! ডাক তো ওকে।'—দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ফেরিওয়ালার সঙ্গে আলাপ করে দুই ভাইয়ের আহ্লাদ আর ধরে না। মোক্ষম যা একটি প্যাঁচ এবার পাওয়া গেছে, তার কাছে দারুক-মূষিক কোম্পানীর কসরৎ কোথায় লাগে!

ফেরিওয়ালার কাঁধে ঝোলানো বিজ্ঞাপনে তার খেতাব লেখা আছে, বল্মী-বিশারদ। গালভরা নামটার আসল মানে হল উইপোকার ওস্তাদ। ফেরিওয়ালা উইপোকা পোষে। সেই পোষা উই দিয়ে পুঁথিপত্র দলিল দস্তাবেজ সব যে যেমনটি চাই তেমনি সংশোধন করে দিতে পারে।

তাকে ঠেকাবার ক্ষমতাও কারুর নেই। দারুকের শুয়োর মার্কা মূষিক তো ছার, সবচেয়ে পুচকে নেংটি ইঁদুরের ল্যাজও যেখানে ঢোকে না চুলের মতো মিহি তেমন একটা ফুটো পেলেই তার কাজ ফতে।

তার পোষা উইয়েদের অসাধ্য কিছু নেই। হুকুম পেলে তারা রাজ-ধানীর মহাফেজ খানাই এক রাত্রে সাফ করে দিতে পারে।

মহাফেজ খান নয়, সামান্য ক'টা ছত্র। আনন্দে গদগদ হয়ে নকুল-সহদের বারণাবতের জতুগৃহদাহের কোন জায়গাটা লোপাট করতে হবে বুঝিয়ে মোটা বায়না দেয় বল্মী-বিশারদকে। তাইতেই সর্বনাশ হয়।

পোষা উই-বাহিনী কাজ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু একচুল দিক ভুলের দরুণ বারণাবতের জতুগৃহের বদলে বিরাট পর্বের ভীম-কীচক যুদ্ধটাই দেয় চিরকালের মতো কেটে লোপাট করে।
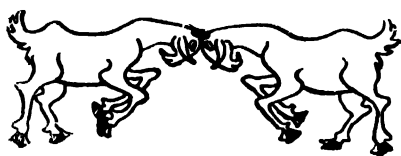
রামলগনের রামছাগল

স্বপন বুড়ো

রামলগন যে বিরাট বড়লোকের বাড়ীর দারোয়ান সেখানে তাকে বিশেষ খাটাখাটুনি করতে হয় না।

রোজ তার প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠিটাকে তেল দিয়ে বহুক্ষণ ধরে মালিশ আর পালিশ করে। সেটা তার নিত্য কর্ম। মনিব বাড়ীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট চক মেলানো দালান সঙ্গে সামনে ফুলের বাগান. আর পেছনে ফলের বাগান, মনিব বাড়ীর কাছেই একটা নদী। খুব ভোরে উঠে রামলগন সীতারামের ভজন গাইতে গাইতে সেই নদীতে স্নান করে নিজের লোটাটাকে মেজে মেজে সোনার মতো করে তোলে। আর কাজের মধ্যে সারাদিন ধরে ঘিউ

দিয়ে মোটা মোটা রুটি পাকায়, অড়হরকা ডাল ঘন করে রান্না করে, আর খেয়ে খেয়ে নিজের ভুড়িটাকে বাগায়।

রামলগন রোজ রাত্রে তার তেল পালিশ করা সেই লাঠিটা নিয়ে একবার হুংকার দিয়ে গোটা বাড়ীটা ঘুরে আসে। তারপর নিজের খাটিয়াটা টেনে নিয়ে এমন দারুণ ঘুম লাগায় যে রাত্রিতে মশা, মাছি, সাপ কি জানোয়ার কেউ তার ঘুম ভাংগাতে পারে না। সবাই তার নাকের ডাক শুনতে পায়। আর তাতেই সকলে বুঝতে পারে যে, রামলগন নিষ্ঠার সংগে বাড়ী পাহারা দিচ্ছে।

একবার রামলগনের মনিব বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দারুণ পেটের অসুখ হল।

পল্লী অঞ্চল। এখানে ডাক্তার নেই, কেউ ডাক্তারী ওষুধও খায় না। বৃদ্ধ কবিরাজ মশাই রয়েছেন গ্রামে। তাকে ডাকা হল। তিনি বড়ির ব্যবস্থা করেছেন, আর বল্লেন, দীর্ঘকাল ছেলেমেয়েদের দুধ খেতে হবে।

বাড়ীর সবাই হকৃচকিয়ে গেল। ছাগলের দুধ? সে আবার কী করে যোগাড় করা যাবে? গোয়ালে অনেকগুলি গরু রয়েছে। সবাই তারই দুধ খায়।

কবিরাজ মশাই বললেন, ওই তো রামলগন রয়েছে বসে বসে শুধু ঘিউ রোটি অড়হরকা ডাল খাচ্ছে, আর ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। ওকে তোমরা একটা ছাগল কিনে দাও। রামলগনই তাকে মানুষ করবে। মাঠে নিয়ে গিয়ে তাজা ঘাস খাওয়াবে, ছাগলটিও ভালো দুধ দেবে। সেই ছাগলের দুধ খেয়ে ছেলেপিলেদের পেটের অসুখ একেবারে ভালো হয়ে যাবে।

ছেলেপিলেদের অসুখ সারাবার জন্য অবশেষে সেই ব্যবস্থাই হল।

বাড়ীতে এলো রামলগনের ছাগল।

ছাগল শুধু দুধই দেয়না। সে বাড়ীর এক দঙ্গল ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী হয়ে উঠল। ছাগলটাকে নিয়ে ওদের আনন্দের অবধি নেই। ওর গলায় দড়ি বেঁধে ছেলের দল তাকে মাঠে বেড়াতে নিয়ে

যায়। সেখানে কচি কচি সবুজ ঘাস খাওয়ায়। মেয়েরা কাঠাল পাতা মুখের সামনে ধরে বলে খা ছাগল, চটপট খেয়ে নে।

ছাগল গম্ভীরভাবে তার ছাগলদাড়ি নাড়ে, মনে হয় বাড়ীর ছেলে-পিলেদের সবকথা সে দিব্যি বুঝতে পারে।

আস্তে আস্তে ছাগল আরো বড় হয়ে ওঠে। রামলগনের তৈরী রোটিগুলি সে অবলীলাক্রমে চিবিয়ে খেয়ে নেয়। অড়হরকা ডাল খায়।

তারপর দাড়ি নেড়ে নিজের কৃতজ্ঞতা জানায়।

বাড়ীর অন্দর মহল থেকে চাল ভিজে, মুগ ভিজে আসে। ছাগল চপ্ চপ্ করে সব খেয়ে নেয়।

গিন্নীমা আমসত্ব রোদ্দুরে দিয়েছে, রামলগনের ছাগল কখন চুপিসারে এসে সাফ করে ফেলে। বাড়ীর ঠাকুরমা ঠাকুর পূজোর জন্য নানাভাবে নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছেন। ছাগলটা কিভাবে জানতে পেরে চোখের পলকে সব শেষ করে দেয়। তখন ঠাকুরমার কপাল চাপড়ানোই সার হয়। এইভাবে খেয়ে খেয়ে রামলগনের ছাগলটা একেবারে রামছাগল হয়ে ওঠে।

বিরাট তার চেহারা। যেমন উঁচু, তেমনি কালো। ঘন-ঘন দাড়ি নেড়ে যখন হাঁটে, তখন চর্বিতে ঘা তার মট্মট্ করে। গ্রামসুদ্ধ লোক ওর নাম দিয়েছে—'রামলগনের রামছাগল।' সবাই অবাক হয়ে রামলগনের রামছাগলের কলেবর বৃদ্ধি দেখে। ধীরে ধীরে সকলের দৃষ্টি ওই রামছাগলের ওপর পড়ে।

পাড়ার ষণ্ডা-গুণ্ডা ছেলেরা দল-আড়ালে আলোচনা করে, আচ্ছা তোরাই বল, রামলগনের ওই রামছাগলটা মিছিমিছি সারা পাড়া ঘুরে বেড়ায় – এই গাঁয়ের কারো কোনো উপকারে আসে না। চল্ একদিন নৌকো করে গিয়ে একটা বিরাট চড়ুইভাতি করা যাক। সেখানে রামলগনের রামছাগলটা যে মাংস দেবে তাতে আমাদের বিরাট ভোজ হয়ে যাবে।

সব ঠিকঠাক। ডেকচি কড়াইয়ের ব্যবস্থা হল। একটা নৌকো

ভাড়া করা হল। নদীতে গিয়ে দূরের এক চড়ায় নেমে চড়ুইভাতি করবে ছেলের দল। ছেলেরা মা পিসিদের দিয়ে গোপনে লংকা, হলুদ বেঁটে পর্যন্ত সব কিছু ঠিক করে ফেললো। জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত নৌকোয় চালান করে দেওয়া হল। একদল উৎসাহী ছেলে কলাপাতা কেটে আঁটি বেঁধে ফেললো। কিন্তু যাকে নিয়ে বিরাট যজ্ঞি ব্যাপার হবে, সেদিন আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আসল কথাটা হচ্ছে রামলগন একটা ছেলের কাছে ষণ্ডা-গুণ্ডাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে। সেদিন আর রামলগন তার রামছাগলকে কিছুতেই বাইরে বেরুতে দেয়নি। গলায় দড়ি বেঁধে উঠোনে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের বলেছিল ওকে খুব করে কাঁঠালপাতা, চাল, মুগ ভিজে, ফুল, বেলপাতা, কলাই সব কিছু খাওয়াতে। আজ ওকে কিছুতেই বাইরে বেরোতে দেবে না।

ছেলেরাও কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। ষণ্ডা-গুণ্ডা ছেলের দল রাত্রিরের অন্ধকারে ঘুরঘুর করে বেরালো কিন্তু রামলগনের রামছাগলের কোনো হদিসই তারা পেলে না। তখন ভাড়া করা নৌকো নিয়ে তারা অন্য ব্যবস্থা করতে চলে গেল। সেই থেকে রামলগন খুব সাবধান হয়ে গেল।

কিন্তু বাড়ীর ভেতরে রামছাগল নতুন নতুন উৎপাত শুরু করে দিল।

একদিন দেখা গেল পিসিমার তৈরী সব আচার রামছাগলটা খেয়ে ফেলেছে।

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন ছোট ছোট জুতো কেনা হয়েছিল, রামছাগল একদিন সব চিবিয়ে খেয়ে ফেললো।

তখন ছেলে মহলে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। আবার একদিন দেখা গেল নৌকোর তলায় লাগাবার জন্য গাব ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল রামছাগল সব খেয়ে ফেলেছে।

সেদিন রামছাগল ঠাকুরমার পূজো করবার নতুন গরদের সাড়ীটা

চিবিয়ে শেষ করে দিল, সেদিন ঠাকুরমা অগ্নিশর্মা হয়ে আদেশ করলেন, রামলগন, এক্ষুনি তোমার রামছাগলকে বাড়ী থেকে বিদায় করো !

ঠাকুরমার এই আদেশে ছেলেমেয়ের দল রাম ছাগলটাকে লুকিয়ে একেবারে তাদের টেবিলের নীচে বেঁধে রাখলে। এইভাবে ওর একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

সবাই ঠাকুমাকে বুঝিয়ে বললে,—আহা কেষ্টর জীব। এতদিন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দুধ খাইয়েছে। অবলা প্রাণী। ওটা না হয় থাক।

নাতি-নাতিনীদের আগ্রহে ঠাকুরমা আর কিছু বললে না।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা থিয়েটার করবে বলে মেতে উঠল। নাটকের নাম রাণাপ্রতাপ। উঠোনের মাঝখানেই মঞ্চ তৈরী করা হবে। ছেলেরা ইতিহাসের বই পড়ে নিজেরাই নাটক লিখে নিয়েছে। এক-কোণের একটা খালি ঘরে মহলাও শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু চৈতকের পিঠে রাণা প্রতাপকে মঞ্চে দেখাতে হবে। তার কী ব্যবস্থা হবে ? ঘোড়া কোথায় মিলবে ? আর যদিও বা পাওয়া যায় সেই ঘোড়ার পিঠে ছোট ছেলে উঠবে কি করে ? এ এক মহা সমস্যা !

ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। একজন বললে, আরে এত ভাববার কি আছে ? নাটক থেকে চৈতকটাকে বাদ দিয়ে দে ?

তখন নাট্যকার আবার গোসা করে হুঁ, কেটে বাদ দিলেই হল। ইতিহাসে লেখা আছে প্রতাপের চৈতক !

তখন খঞ্জা মামা এগিয়ে এল সমস্যার সমাধান করতে। খঞ্জা মামা নাটকে ছেলেদের সব সাজিয়ে দেবার ভার নিয়েছে। তাই তার কথার একটা দাম আছে।

খঞ্জা মামা বললে, তাদের ওই রামলগনের রামছাগলটাকে আমি চৈতক সাজিয়ে দেবোখন—তাহলেই হবে ত ?

ছেলেরা শুনে অবাক !

—রামছাগল একেবারে চৈতক হয়ে যাবে ?

খঞ্জা মামা তার ভুরু নাচিয়ে বললে, পচা, ট্যাংরা আর হাবুলকে

যদি প্রতাপ সিংহ, শক্ত সিংহ আর মোগল বাদশা আকবর সাজিয়ে দিতে পারি, তাহলে ওই রামলগনের রাম ছাগলটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে আর রাণা প্রতাপের চৈতক করে দিতে পারবো না? বুঝলি— এরই নাম হচ্ছে নাটক। যে যা নয়, তাকে তাই সাজিয়ে দিতে হবে।

ছেলের দল খঞ্জা মামার কথা শুনে খুব খুশী। এই না হলে আর রূপসজ্জাকর! সবাই নিশ্চিন্ত হল।

ছেলের দল মহা আনন্দে মহলা চালিয়ে যেতে লাগল। খঞ্জা মধ্যে মোটা পিস্‌বোর্ড কেটে ঘোড়ার সাজ তৈরী করে ফেলল। সাজ-পোষাক যাতে ঐতিহাসিক হয় সেদিকে খঞ্জা মামার প্রখর দৃষ্টি। রাণা প্রতাপকে সাজাতে হবে, আবার তার চৈতককেও তেমনি করে তৈরী করে নিতে হবে।

অভিনয়ের দিন সারা গাঁয়ের মাতব্বর আর বৌ-ঝিরা বিরাট উঠোন ভর্তি করে ফেলল।

অবশেষে কনসার্ট বাজিয়ে, ঘণ্টা দিয়ে—সুরু হল নাটক।

প্রথম দৃশ্যেই চৈতকের পিঠে চেপে রাণা প্রতাপের প্রবেশ। রামছাগলটাকে নানারকম সাজপোষাক পরিয়ে ঘোড়ার মতোই সাজানো হয়েছে।

সারা উঠোন ভর্তি মানুষ তাদের চিরচেনা রামছাগলটাকে দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

চারদিক থেকে হাততালি শব্দে ভড়কে গিয়ে চৈতকের বেশে রামলগনের রামছাগল এমন ছুট লাগাল যে প্রতাপ সিংহ একেবারে পপাত ধরণীতলে!

প্রতাপ সিংহবেশী পচা একেবারে গেলুম গেলুম বলে পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠল।

খঞ্জা মামা মঞ্চে বেরিয়ে পচাকে টেনে তুলল। তখন দেখা গেল, পচার একটা পা একেবারে মচ্‌কে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জা মামা হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—ওরে তোরা ড্রপ ফ্যাল্— ড্রপ ফ্যাল্!

যবনিকা পতন হয়ে গেল প্রথম দৃশ্যে। সেদিন আর নাটক করা সম্ভবপর হল না। উঠোন ভর্তি মানুষ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে ঘরে ফিরে গেল।

তারপর পচার হাঁটুতে হলুদ-চূণ গরম করে সারারাত ধরে লাগানো হতে থাকল। প্রতাপ সিংহের চোখে আর ঘুম নেই! সমস্ত রাত সে গেলুম-গেলুম চীৎকার করতে লাগল। আসল কথা, রামছাগলের পিঠ থেকে ছিট্‌কে পড়ে ওর যতটা না লেগেছিল, তার চাইতে বেশী ভয় পেয়েছিল!

নাটকের পালা ত এইভাবে ভেস্তে গেল। আবার ঠাকুমা হুকুম জারি করলেন, ওই অলক্ষুণে ছাগলটাকে বাড়ী থেকে বিদায় করো! কিন্তু নাতি-নাতনীর দল কিছুতেই সেই রামছাগলটিকে ছাড়তে রাজি নয়। তাই ওরা সবাই মিলে পালা করে ওটাকে ঠাকুমার চোখ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখল। ঠাকুমা ওকে চোখের সামনে দেখতে না পেলেই আর কোনো ভয় নেই!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আর এক কাণ্ড!

একতলার একটি কোণের ঘরে ঠাকুমার ঠাকুর—শ্রীবাল-গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন। নিত্য পূজো ত হয়ই, তার ওপর ঠাকুমা দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পার্বণের দিনে বিশেষ পুজোর আয়োজন করে থাকেন।

সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী।

সারাদিন ধরে উৎসব, আর কীর্তন চলেছে। বাল-গোপালের সারা অঙ্গে সোনার গয়না। মাথায় সোনার চূড়ো। পায়ে নূপুর। এইভাবেই ঠাকুর সিংহাসনে বসানো আছে। নিমন্ত্রিতেরা এসে ভোগ আর প্রসাদ খেয়ে গেছে।

সেদিন সকলেই ক্লান্ত। বাড়ী শুদ্ধ মানুষ সারাদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। ঠাকুমা বাল-গোপালের অঙ্গ থেকে সোনার গয়নাগুলো আর খুলে রাখেন নি। সেইভাবেই ঠাকুর সিংহাসনে আসীন আছেন।

গভীর রাত্রে কোথায় যেন ঠুক ঠুক শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

রামলগন তার খাটিয়াতে ভোঁস্‌ভোঁস্ করে ঘুমাচ্ছে। ঠাকুমার দেয়া প্রসাদ খেয়ে তার ভুঁড়ি উঁচু হয়ে উঠেছে।

কর্তারা সুখে নিদ্রা দিচ্ছে নিজেদের কামরায়। ঠাকুমা-দিদিমা-মাসিমা-পিসিমার দল সারাদিন ধরে বহু খাটা-খাটুনি করেছে। তারা আঁচল পেতে পড়েছে আর মরেছে। ঝি-চাকরেরা নিজেদের ঘরে ভোঁস্‌ভোঁস্ করে নাক ডাকাচ্ছে।

এমন সময় বাড়ীর এক কোণে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ। একটা সিঁধেল চোর এসেছে—শাবল হাতে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাল-গোপালের গয়নাগুলো চুরি করে রাতের আঁধারে পালাবে। চোরটা ভালো করেই জানে, সারাদিনের খাটুনীতে সবাই মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। এই ঘুম তাদের সহসা ভাঙবে না। তাই শাবল হাতে তার এই নৈশ অভিযান।

চোর সিঁদ কেটে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। তারপর ধীরে ধীরে বাল-গোপালের গয়নাগুলো খুলে নিয়ে পুঁটলি বেঁধে আবার সেই গর্তের ভেতর দিয়ে মাথাটা বের করে দিল।

রামলগনের রামছাগল এতক্ষণ অবাক হয়ে চোরের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল।

এইবার যেই চোর গর্তের ভেতর দিয়ে তার মাথাটা বের করে দিয়েছে, অমনি রামছাগলটা কয়েক পা পিছু হটে একেবারে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে ওর মাথায় মারলে এক ঢুঁ!

অমনি চোরটা 'বাবারে-মারে-গেছিরে' বলে আর্তনাদ করে উঠল।

সেই চীৎকারে বাড়ীর সবাই জেগে উঠল। রামলগন লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো। সবাই এসে জুটল সেখানে।

ঠাকুমা বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি। রামছাগলটা ঢুঁ মেরে চোরটাকে কুপোকাৎ করেছে। তাই না আমার বাল-গোপালের গয়নাগুলো এমনভাবে বেঁচে গেল। ও না থাকলে আমার কী যে সর্বনাশ হত। ওর সিং দুটো আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো।

পেশোয়ার কী আমীর

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি একটা পাকা আম কায়দা করতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু বেশিক্ষণ খেতে হল না। গোটা কয়েক কামড় দিয়েই ফেলে দিতে হল—অ্যায়সা টক! দাঁতগুলো শির্ শির্ করতে লাগল—মেজাজটা বেজায় খিচড়ে গেল আমার। বাড়ীতে মাংস এসেছে দেখেছি—রাত্তিরে জুত করে হাড় ছিবুতে পারবো কিনা কে জানে।

এই সময় কোত্থেকে পটলডাঙ্গার টেনিদা এসে হাজির। গাঁক গাঁক করে বলল, এই প্যালা আমাটা ফেলে দিলি যে?

—যাচ্ছেতাই টক। খাওয়া যায় না কি?

টক? টেনিদা ধুপ করে আমার পাশে বসে পড়ে বললে। টক বলে বুঝি গ্রাহ্যি হল না? সংসারে টক যদি না থাকতো তাহলে আচার পেতিস কোথায়? টক যদি না থাকতো তাহলে কী করে দই জমত? টক যদি না থাকত তাহলে চাল কুমড়োর সংগে কামরাঙ্গার তফাৎ কী থাকত? টক যদি না-থাকত তাহলে পিঁপড়েরা কী করে টক্ টক্ হত? টক না-থাকলে—

টক না থাকলে পৃথিবীতে আরো আরো অনেক অঘটন ঘটত—কিন্তু সে সবের লম্বা লিষ্টি শোনবার মত উৎসাহ আমার ছিল না। আমি বাধা দিয়ে বল্লুম,—তাই বলে অত টক আম কোন ভদ্দরলোক খেতে পারে না কি?

আমের গন্ধে কোত্থেকে একটা মস্ত নীল রংয়ের কাঁঠালে মাছি এসেছে, সেটা শেষতক টেনিদার খাঁড়ার মতো মস্ত নাকটার ওপর

বসবার চেষ্টা করছিল। আমার কথা শুনে টেনিদার সেই পেল্লায় নাকের ভেতর থেকে রণ-ডম্বরুর মতো একটা বিদকুটে আওয়াজ বেরুলো। মাছিটা শূণ্যে বার-দুই ঘুরপাক খেয়ে বোঁ করে মাটিতে পড়ে গেল—ভির্মি খেল না হার্টফেলই করল কে জানে?

টেনিদা বললে, ই-স্-স্! খুব যে ভদ্দরলোক হয়ে গেছিস দেখছি! তবু যদি প্যালা জ্বরে ভুগে দু-বেলা পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল না খেতিস! তুই কি আমার গাবলুমামার চাইতেও ভদ্দরলোক? জানিস গাবলুমামা এখন চারশো টাকা মাইনে পায়?

আমি ব্যাজার হয়ে বল্লুম, জেনে আমার লাভ কি? তোমার গাবলুমামা তো আমায় টাকা ধার দিতে যাচ্ছে না?

—তোর মতো অখাদ্যিকে টাকা ধার দিতে বয়ে গেছে গাবুলমামার। টেনিদার নাক দিয়ে আবার একটা আওয়াজ বেরুলো: জানিস্—তিনবার আই-এ ফেল করা গাবলুমামা অতবড় চাকরিটা পেলো কী করে? স্রেফ টক্ আমের জন্যে!

—টক আমের জন্যে! আমি হাঁ করে রইলুম: টক আম খেলে বুঝি ওই রকম চাকরি হয়?

খেলে নয়রে গাধা—খাওয়ালে। তবে তাক বুঝে খাওয়াতে জানা চাই। বলছি তোকে ব্যাপারটা—অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবি। তার জন্য গলির মোড় থেকে দু-আনার ডালমুট নিয়ে আয়।

জ্ঞান লাভ করতে চাই আর না চাই, টেনিদা যখন একবার ডালমুট খেতে চেয়েছে—তখন খাবেই। পকেটে পয়সা থাকলেই ও টের পায়। কী করি আনতে হল ডালমুট।

—তুই পেটরোগা এসব খেতে নেই বলে হ্যাচকা টানে টেনিদা ঠোঙ্গাটা কেড়ে নিলে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। খেতে যখন দেবে না, তখন বেশ করে নজর দিয়ে দিই। পরে টের পাবে।

টেনিদা ভ্রূক্ষেপ করলে না। বললে, তবে শোন্। আমার মামার বাড়ী কোথায় জানিস্ তো?

—খড়গপুরে। সেই যে খড়গপুর—যেখানে রেলের অনেক ইঞ্জিন-টিঞ্জিন আছে?

সেবার গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেছি। ওই যে একটা ছড়া আছে না—মামাবাড়ি ভারি মজা—কিল চড় নাই?" কথাটা একদম বোগাস্—বুঝলি কক্ষনো বিশ্বাস করিসনি!

অবশ্যি মামাবাড়িতে যে ভালো লোক নেই তা নয়। দিদিমা-দাদু এরা বেশ খাসা লোক। বড়মামীরাও মন্দ হয় না। কিন্তু ওই গাবলুমামা-টামা, বুঝলি, ওরা ভীষণ ডেঞ্জারাস্ হয়!

বললে বিশ্বাস করবি সাতদিনের মধ্যে গাবলুমামা দুবার আমার কান টেনে দিলে। এমন কিছু করিনি। কেবল একদিন ওর ঘড়িটায় একটু চাবি দিয়েছিলুম তাতে নাকি স্প্রিংটা কেটে গিয়েছিল। আর একদিন ওর সাদা নাগরাটা কালো কালি দিয়ে একটু পালিশ করে ছিলুম, আর নেটের মশারিতে কাঁচি দিয়ে একটা গ্রাণ্ড জানলা বানিয়ে দিয়েছিলুম। এরজন্য দুদিন আমার কান ধরে পাক দিয়ে দিলে। কী ভীষণ ছোটলোক বল্ দিকি!

তা মারে মারুক গাবলুমামা—খড়গপুরে দিনগুলো আমার ভালোই কাটছিল। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া—সকলে ইষ্টিশানে রেল দেখে বেড়ানো, হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাঁসাইয়ের পুল পর্যন্ত চলে যাওয়া সেখানে বেশ চড়ুইভাতি আরো কত কী! বেশ ছিলুম।

বেশ মনের মতো বন্ধুও জুটে গিয়েছিল একটি। তার ডাকনাম ঘটা—ভালো নাম ঘটকর্পর। ওর ছোট ভাইয়ের নাম ক্ষপর্ণক, ওর দাদার নাম বরাহ। ওদের বাবা গোবর্ধনবাবুর ইচ্ছে দিল—ওদের ন-ভাইকে নিয়ে নবরত্ন সভা বসাবেন বাড়িতে।

কিন্তু ক্ষপর্ণকের পর আর ভাই জন্মালো না—খালি বোন আর বোন। রেগে গিয়ে গোবধনবাবু তাদের নাম দিতে লাগলেন, জ্বালামুখী, মুণ্ডমালিনী এই সব। এমন কী খনা পর্যন্ত নাম রাখলেন না কারুর।

তা এই তিন রত্নেই যথেষ্ট। একেবারে তিন তিরিখেই নয়? এক

একটা বিচ্ছু অবতার। আর ঘটা তো একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানির ঘট।

আগে কি আর বুঝতে পেরেছিলুম তাহলে ঘটার ত্রিসীমানায় কে যায়? ওর ঠাকুরমার ভাড়ার থেকে আচার টাচার চুরি করে এনে আমায় খাওয়াতো—আমি ভাবলুম অমন ভালো ছেলে বুঝি দুনিয়ায় আর হয় না!

কিন্তু শেষকালে এই ঘটাই আমাকে এমন এক খানা লেঙ্গি মারলো সে কি বলবো!

একদিন দুপুর বেলা গাবলু মামা বেশ প্রেমসে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর আমি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি—ঝুঁকি মারছি। একটা ছিপ চাঁছব—গাবলুমামার দাড়ি কামানোর চকচকে ক্ষুরটা হাত সাফাই করতে পারলে ভীষণ সুবিধে হয়।

এমন সময় ফিস্ ফিস্ করে ঘটা আমার কানে কানে বললে, এই টেনি, আম খাবি? কেন খাব না—খেতে আর ভয় কী! আর আমায় জানিস্ তো প্যালা—খাওয়ার ব্যাপারে কাপুরুষতা আমার একদম বরদাস্ত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে দুহাত তুলে লাফিয়ে উঠে আমি বললুম কোথায় রে?

—আমাদের বাগানে।

আমি বললুম, ওরে বাবা!

বলবার কারণ ছিল। গোবধনবাবুর খুব ভালো একটা আমের বাগান আছে। বাছাই বাছাই কলমের আম। ল্যাংড়া, বোম্বাই, মিছরিভোগ—আর কত কী? মাইল দূর থেকেও আমের গন্ধে জিভে জল আসে। কিন্তু কাছে থাকে সাধ্য কার। যমদূতের মতো একটা অ্যায়সা জোয়ান মালী রাতদিন খাড়া পাহারা দিচ্ছে সেখানে। একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছ কী সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়বে ওখানে হচ্ছে কী? ও-সব চলিবেনি। না পালাইছ তো পিট্টি খাইবে।

ঘটা বললে কিচ্ছু ঘাবড়াসনি—বুঝলি? আজ জামাই ষষ্ঠী কিনা

মালী এবেলা শ্বশুরবাড়ী গেছে। ভালোমন্দ খেয়ে দেয়ে সন্ধের পর ফিরবে। আজকেই সুযোগ!

অমন জাঁদরেল মালীরও শ্বশুর বাড়ী থাকে—আমার বিশ্বাসই হয় না। ঘটা বললে, সত্যি বলছি টেনি। চল না বাগানে গেলেই বুঝতে পারবি।

গেলুম বাগানে। বেগতিক দেখলেই রাম দৌড় লাগাবো লম্বা ঠ্যাং দুটো তো আছেই।

গিয়ে দেখি সত্যিই তাই। মালীর ঘরে মস্ত তালা ঝুলছে। আর বাগানে?

গাছ ভর্তি আম আর আম! তাদের কী রং আর ক্যায়সা খোশবু! মনে হল যেন স্বর্গের নন্দনবনে এসে ঢুকেছি আর চারদিকে অমৃত ফল ঝুলছে! কিন্তু হলে কী হবে? প্রায় সব গুলি গাছই বিচ্ছিরি রকমের জাল দিয়ে ঘেরাও করা। ঢিল মারলে পড়বে না— আঁকশিতে নামবে না।

শুধু একদিকে বেঁটে চেহারার একটা গাছে কোন জালই নেই। আর, কী আম হয়েছে সে গাছে! মাটির হাত খানেক কাছাকাছি পর্যন্ত আম ঝুলে পড়েছে। পেকে টুক্ টুক্ করছে আমগুলো—লালে আর হলদেতে কী আশ্চর্য তাদের রং। দেখেই আনন্দে আমার মূর্ছা যাওয়ার জো হল।

ঘটা বললে, এ আমের নাম হল পেশোয়ার কী আমীর। আমের সেরা। খেলে মনে হবে পেশোয়ার আংগুর ভীম নাগের সন্দেশ আর কাশীর চমচম একসংগে খাচ্ছি। লেগে যা টেনি—

বলবার আগেই লেগে গেছি আমি। চক্ষের নিমেষে টেনে নামিয়েছে গোটা পনেরো পেশোয়ার কী আমীর। তারপর বেশ টুসটুসে একটা আমে যেই কামড় বসিয়েছি—

সংগে সংগে কী যে হল সে আমার মনে নেই প্যালা। আমি মাথা ঘুরে সেইখানেই বসে পড়লুম। ওরে বাপ্পস্—কী টক! দশ মিনিট ধরে খালি মনে হতে লাগল আমার দুপাটি দাঁতের ওপর কেউ দমাদম

হাতুড়ি ঠুকছে—আমার ছুকানে তিরিশটা ঝিঁঝি পোকা কোরাস গাইছে, আমার নাকের ওপর তিন ডজন উচ্চিংড়ি লাফাচ্ছে, আমার মাথার ওপর সাতটা কাঠ ঠোকরা এক নাগাড়ে ঠুকে চলেছে।

যখন জ্ঞান হল—তখন দেখি ছু ডজন পেশোয়ার কী আমীর সামনে নিয়ে আমি বসে আছি ধূলোর ওপর। ঘটার চিহ্নমাত্র নেই। ঘটকর্পর কর্পূরের মতোই উঠে গেছে।

কী শয়তান, কী বিশ্বাসঘাতক! একবার যদি ওকে সামনে পাই, তাহলে ওর নাক খিমচে দেব, কান কামড়ে দেব, পিঠে জলবিছুটি ঘষে দেব, ওর ছুটির টাস্কের সব অংকগুলো এমন ভুল করে রেখে দেব যে ইস্কুলে গেলেই সপাসপ বেত। কিন্তু সে পরের কথা পরে। এখন কী করি।

আমের লোভেই কী না কে জানে, পাটকিলে রংয়ের মস্ত দাড়িওলা একটা রামছাগল গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগুচ্ছে। সমস্ত রাগ রামছাগলের ওপরে গিয়ে পড়ল। বটে—আম খাবে! ভাখো একবার পেশোয়ায় কী আমীরকে পয়থ করে।

ছাগলে সব খায়—জানিস তো প্যালা? ছাতা খায় খাতা খায়, হকিস্টিক খায়—'জুতো বুরুশওয়ালাকেও যে' বাগে পেলে খায় না। একথা জোর করে বলা যায় না। আমার সেই কামড় দেওয়া আমটাকেই দিলুম ছুড়ে ওর দিকে।

মাটিতেও পড়তে পড়তে পেলো না—ক্রিকেট বলের মতোই আকাশে লাফিয়ে উঠে ছাগলটা আমটাকে লুফে নিলে। তারপর?

ব্যা-আ-আ-করে গগনভেদী আওয়াজ হল একটা। একটা নয় যেন সমস্ত ছাগল জাতি একসংগে আর্তনাদ করে উঠল। তারপরেই টেনে একখানা দৌড় মারল! সে কী দৌড় রে প্যালা! চক্ষের পলকে বাগান পেরুলো, মাঠ পেরুলো লাফ মারতে মারতে খানা খন্দল পেরুলো। বোধহয় মেদিনীপুরে গিয়েই শেষতক সেটা থামল।

আমি জ্বলন্ত চোখে আমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ঘটাকে একটা খাওয়াতে পারলে বুকের জ্বালা নিভত। কিন্তু সেটাকে আর

পাই কোথায় ? তিন দিনের মধ্যেও তার টিকির ডগাটি পর্যন্ত দেখতে পাব না এটা নিশ্চিন্ত।

তাহলে কাকে খাওয়াই ?

নির্ঘাত গাবলুমামাকে। দু-দিন আমার কানদুটো বেহালার কানের মতো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়েছে। এ আম গাবলুমামার খাওয়ার দরকার।

গোটা আস্টেক আম কোঁচড়ে নিয়ে ফিরে এলাম।

ভগবান ভরসা থাকলে সবই সম্ভব হয় প্যালা—বুঝলি ? বাড়ি ফিরে দেখি ভীষণ হৈ চৈ ! গাবলুমামা কোন সাহেবের সংগে দেখা করতে যাচ্ছে চাকরির চেষ্টায়। দইয়ের ফোঁটা-টোঁটা পরানো হচ্ছে। দিদিমা, বড় মাসী দাদু একসংগে দুর্গা দুর্গা কালী কালী এই সময় আওড়াচ্ছেন।

গাবলুমামার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি—কেউ নেই। শুধু টেবিলের ওপর, রং চংয়ে একটা বেতের ঝুড়ি তাতে বাছাবাছা সব বোম্বাই আম। ভগবানই বুদ্ধি দিলে রে প্যালা।

কেউ দেখবার আগেই আমি ঘরে ঢুকে গোটা কয়েক বোম্বাই সরিয়ে ফেললুম—তার ওপর সাজিয়ে দিলুম সাতটা পেশোয়ার কী আমীর—মানে, সাতটা অ্যাটম্ বম্ !

তারপর গোয়াল ঘরে লুকিয়ে বসে সেই বোম্বাইগুলি সাবাড় করছি দেখি না সেই ঝুড়িটা নিয়ে গাবলুমামা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর দাদু দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমানে 'কালী-কালী' বলতে লাগলেন।

এইবার আমার চটকা ভাংগলো। অ্যাঁ-ওই আম সাহেবের কাছে ভেট্ যাচ্ছে। গাবলুমামার অবস্থা কী হবে ভেবে আমারই তো গায়ের রক্ত জমে গেল। চাকরি তো দূরে থাক হাড়গোড় নিয়ে গাবলুমামা ফিরতে পারলে হয়! বেশ খানিকটা অনুতাপই হল এবার। ইস্—এ যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে গেল রে !

বললে বিশ্বাস করবিনি প্যালা—ওই আমের জোরেই শেষতক

গাবলুমামার চাকরি হয়ে গেল। কী করে? সেইটেই তো আদত গল্প।

যে সাহেবটার সংগে মামা দেখা করতে গেল তার নাম ডার্ক-ডেভিল। যতটা না বুড়ো হয়েছে—তার চাইতে বেশি ধরেছে বাতে। প্রায় নড়তে চড়তে পারে না। একটা চেয়ারে বসে রাত-দিন কোঁ-কোঁ করছে? তার হাতেই গাবলু মামার চাকরি।

আমের ঝুড়ি নিয়ে গাবলুমামা সাহেবকে সেলাম দিলে। তারপর নাকটাক কুঁচকে, মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, মাই গার্ডেনস্ ম্যাংগো স্যার—ভেরি গুড্ স্যার—ফর ইওর ইটিং স্যার।

একদম চালিয়াতি বুঝলি প্যালা? আমার মামার বাড়ির ধারে কাছেও আমের গাছ নেই। তবুও বলতে হয়—গাবলুমামাও চালিয়ে দিলে।

সাহেবটা বেজায় লোভী, তায় রাতদিন রোগে ভুগে লোভ আরো বেড়ে গিয়েছিলো। আমের ঝুড়ি দেখেই সাহেবের নোলা সকসকিয়ে উঠল। তার ওপরে আবার পেশোয়ার কী আমীর—তার যেমন গড়ন, তেমনি রং! তক্ষুণি সে ছুরি বের করলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে।

—কাম বাবু, হ্যাভ সাম (একটুখানি খাও)—বলেই সে এক টুকরো গাবলুমামার দিকে এগিয়ে দিলে।

নো স্যার—আই ইট মেনি স্যার,—এই সব বলে গাবলুমামা হাত-টাত কচলাতে লাগল। কিন্তু সাহেবের গোঁ—জানিস্‌’ তো? ধরেছে যখন খাইয়ে ছাড়বেই।

অগত্যা গাবলুমামাকে নিতেই হল টুকরোটা। আর মুখে দিয়েই—

দাদা গো! গেলুম-বলে গাবলুমামা চেয়ার শুদ্ধ উলটে পড়ে গেল। কষের একটা দাঁত নড়ছিল, সেটাও খসে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

আর সায়েব?

আমে কামড় দিয়েই বিটকেল আওয়াজ ছাড়ল: ও গশ্

গোঁয়াক! তারপরেই তড়াক করে এক লাফে টেবিলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে। মাই গড্—ঘ্যাঁচাৎ!

এই বলে আর এক লাফ! মামায় ওপর ফ্যান ঘুরছিল, সায়েব তার একটা ব্লেডকে চেপে ধরল। তারপর ঘুরন্ত ফ্যানের সংগে শূন্যে ঘুরতে লাগল বাঁই বাঁই করে।

সে কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড—তোকে কা বলব, প্যালা। ঘরের ভেতরে নানারকম আওয়াজ শুনে সাহেবের আর্দালি ছুটে এসেছিল। সে সাহেবকে ফ্যানের সংগে বন বনিয়ে ঘুরতে দেখে বললে, রাম-রাম—এ কেইস্যা কাম! বলে সে কাকের মত হাঁ করে রইল।

আর সেই সময়ই ঘুরন্ত আর উড়ন্ত সায়েবের হাত থেকে পেশোয়ার কী আমীর টুপ্ করে খসে পড়ল। আর পড়বি তো পড় একেবারে আর্দালির হাঁ-করা মুখে!—এ দেশোয়ালী ভাই জান গই রে--বলে আর্দালি পাঁই পাঁই করে একেবারে ইষ্টিশানের প্লাটফর্মে এসে পড়ল। তখন মাদ্রাজ মেল ইষ্টিশান ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এক লাফে তাতেই উঠে পড়ল আর্দালি। তারপর পতন ও মূর্ছা। ওয়ালটেয়ারে গিয়ে না কি জ্ঞান হয়েছিল।

তৎক্ষণে গাবলুমামার চটকা ভেংগেছে। মাথার ওপর সাহেবের বুটের ঠোক্কর কাঁধে এসে লাগতেই গাবলুমামা টেনে ছুট। একদৌড়ে বাড়ীতে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল তারপর একশো চার জ্বর আর তার সংগে ভুল বকুনি। ওই—ওই আসছে। আমায় ধরলে!

বাড়ীতে তো কান্নাকাটি। আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস্। কিন্তু পরের দিন তাজ্জব কাণ্ড। সকালেই সাহেবের দু-নম্বর চাপরাশি গাবলুমামার নামে এক চিঠি নিয়ে হাজির।

ব্যাপার কী?

না—গাবলুমামার চাকরী হয়েছে। আড়াইশো টাকা মাইনের চাক্‌রি।

কেমন করে হল? আরে কেন হবে না? সায়েব তো ফ্যানের ব্লেড থেকে ছিটকে পড়ল। পড়তেই দেখে—আশ্চর্য ঘটনা! সায়েবের

দশ বছরের বাত—হাত-পা ভালো করে নাড়তে পারত না—পেশোয়ার কী আমীরের এক ধাক্কাতেই সে বাত বাপ বাপ করে পালিয়েছে। কাল সারা বিকেল সায়েব মাঠে ফুটবল খেলেছে, আনন্দে সকলকে ভেংচি কেটেছে, বাড়ি ফিরে তার পেল্লায় মোটা মেমসায়েবের সংগে মারামারি করেছে পর্যন্ত।

আর গাবলুমামার জ্বর? তক্ষুণি রেমিশন্! দশ বালতি জলে চান করে, ভাত খেয়ে, কোট-পেণ্টুলুন পরে গাবলুমামা তক্ষুণি সাহেবকে সেলাম দিতে ছুটল।

বুঝলি প্যালা—তাই বলছিলুম। টক আমকে অছেদ্দা করতে নেই। জুৎ-মতো কাউকে খাইয়ে দিতে পারলে বরাত খুলে যায়।

ডালমুটের ঠোঙাটা শেষ করে টেনিদা থামল।

—আহা, এমন বাতের ওষুধ! আমি বললুম সে আমগাছটা—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা বললে। ও-সব ভগবানের দান রে,—বেশিদিন কি সংসারে থাকে? পরদিনই কালবৈশাখীর ঝড়ে গাছটা ভেংগে পড়ে গিয়েছিল।

পদ্মাপাড়ি

—শিবরাম চক্রবর্তী

ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে উঠেছি। ইস্, বড্ডো বেলা হয়ে গেল, ইষ্টিমার ধরতে পারলে হয় এখন! পদ্মা পার হওয়া সহজ ব্যাপার না। আমার পদ্মা-যাত্রা প্রায় গঙ্গাযাত্রার মতোই প্রাণ নিয়ে টানাটানির কাণ্ড!

ভরসা এই, গোদাগাড়ি ইষ্টিমারের গদাই-লস্করি চাল। সকালে ছাড়বার বায়না থাকলেই শুনেছি, সকাল-সকাল সে কোনদিনই ছাড়ে না। তাহলেও লাফিয়ে উঠলাম। দেরি করা ভাল নয়। কাল রাত্তিরের গাড়িতে লালগোলাঘাটে এলেও, ট্রেন থেকে নেমে ইষ্টিশানের সন্দেশের দোকানে এমনি মজেছিলাম যে. রসগোল্লার লালসা মিটিয়ে ইষ্টিমারের ঘাটে গিয়ে দেখি. আমার ইষ্টিমার তখন মাঝ-পদ্মায়। আমার জন্যে মোটেই অপেক্ষা করেন নি।

বাড়ি ফিরছিলাম কলেজের ছুটিতে। পদ্মা পেরিয়ে আমাদের বাড়ি। লালগোলার ঘাটে ইষ্টিমার চেপে ওপারে গোদাগাড়ি ঘাটে গিয়ে নামতে হয়। তারপরে আমমুরা ছাড়িয়ে, ফজলি আমের রাজ্য ভেদ করে, আমসত্ত্বের দেশের ওপর দিয়ে আরও কয়েকটা

ইষ্টিশান গেলেই সাম্‌সি। সাম্‌সি থেকে আবার মাইল দশেকের ধাক্কা—পায়দল্‌ কিম্বা বাসচল্‌—তারপরেই আমাদের গ্রাম চানচল্‌! কিন্তু আমাকে এখনই চঞ্চল হয়ে উঠতে হল। কাল রাত্তিরে ইষ্টিমার ফেল করেছি, সারারাত কেটেছে ইষ্টিশানে—আজ যদি ফের নিজেকে এখানে এনে ফেলতে হয় তাহলেই হয়েছে!

ছুটলাম। স্যুটকেশটা গুছিয়ে নিয়েই ছুট দিলাম। কাল সারারাত কেটেছিল ওয়েটিং রুমে। ওয়েটিং রুম আর সন্দেশের দোকান ভাগাভাগি করে পথে নামতেই সদালাপী মিঠাইওয়ালা বাধা দিলে—"বাবু কোথায় চলেছেন এমন হন্যে হয়ে? গরম গরম পুরি ভাজা হয়েছে খেয়ে যান।"

"তোমার পুরি আমার মাথায় থাক" এই বলে আমি মাথা নাড়ি।

"যদি ইষ্টিমার ধরতে চান তাহলে—"

—"ইষ্টিমারের এখনও দেরি আছে। এই তো? কালও তুমি ঐ কথাই বলেছিলে। ঐ বলে সারারাত তোমার মেঠাই আর মশার কামড় খাইয়েছ। কিন্তু আর না।"

ওর কথায় কান না দিয়ে আমি পা বাড়াই।

ঘাটের কিনারার কাছাকাছি পৌঁছে -আঃ, ঐ যে আমার ইষ্টিমার—সামনেই খাড়া! ধড়ে আমার প্রাণ এলো এতক্ষণে। জেটিতে গিয়ে পড়লাম। জেটিতে ইষ্টিমারে চারধারেই ভারি তাড়া। ভয়ানক হৈ চৈ। এ খালাসি ডাকছে ও খালাসিকে, ইষ্টিমারও ডাকছে—কাকে তা বলা কঠিন। কিন্তু তার দারুণ ভোঁ-ভোঁয় কানে তালা ধরিয়ে দেয়।

এত সব হাঁক-ডাকের মধ্যে শ্রীমতীর আর তর সইছে না -এই কথাটাই স্পষ্ট। মুহূর্তের মধ্যেই উনি মায়া কাটাবেন, এই বার্তাই বুঝি জানাচ্ছেন। এহেন ব্যস্তবাগিস ইষ্টিমারের নাগালে যেতে হলে যে আমাকে দস্তুরমতো বেগ পেতে হবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

বেগ পেতে হলও। এতক্ষণ তীরবেগে ছুটোছুটি করে পদ্মার তীরে পৌঁছে এসে দেখি কিনা—ইষ্টিমার জেটির বাঁধন কেটেছেন। ইষ্টিমারে আর জেটিতে বেশ কয়েক-হাতের ফারাক তখন। ইষ্টিমারের পাটাতন—ইষ্টিমার ভিড়লে যেটা জেটির গায়ে এসে লাগে যার ওপর দিয়ে যাত্রিরা ওঠে নামে—যায় আসে—গট্ গট্ করে হাঁটে—কুলিরা বিলকুল মাল তোলে নামায়—যার সঙ্গে ইষ্টিমারের জেঠতুতো সম্পর্ক—সেই সম্পর্ক আর নেই।

ইষ্টিমারের খালাসিরা পাটাতন তুলে নিতে যাচ্ছে।

এখন বুকের পাটা চাই! আমি আগু-পিছু করি। লাফ দেব—কি দেব না? তারপর মারি লাফ! পড়ি গিয়ে পাটাতনের ওপর—পদ্মার ভগ্নাংশ পার হয়ে। বসে পড়ি গিয়ে। সবাই হৈ হৈ করে ওঠে।

ইষ্টিমারের জেটির সব লোক। কিন্তু কে কী বলছে তখন কি আর আমার হুঁস আছে, না কিছু দেখছি, না শুনছি! পায়ের তলায় পাটাতন পেয়েছি এই ঢের। এক মুহূর্ত বসে থাকি আমি, তারপর টলতে টলতে উঠি, উঠে দাঁড়াই। স্যুটকেস আমার হাতে তখনও। তারপর আমার নজর পড়ে নিচের দিকে। পাটাতনের তলদেশে থৈ-থৈ জল। আবার আমি বসে পড়ি। পাটাতনের নিচেই পদ্মার বিস্তার। আমার মাথা ঘুরতে থাকে। উবুড় হয়ে পড়ি আমি—পাটাতনের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটি···আস্তে আস্তে এগুতে থাকি···স্যুটকেস টানতে টানতে। হামাগুড়ি দিচ্ছি তো দিচ্ছিই। ইষ্টিমারের ডেক মনে হয় যেন মাইল-দেড়েক দূরে। যাই হোক, যত দূরেই হোক, যত দেরিই হোক, গুঁড়ি মেরে মেরে পৌঁছলাম গিয়ে ডেকএ দেহের সঙ্গে সঙ্গে সারা মনও যেন আমার ডেকে উঠল—পেয়েছি! পেয়ে গেছি!

ডুকরে উঠল আমার মনের থেকে ধন্যবাদ—বিধাতার উদ্দেশে—ইষ্টিমারের উদ্দেশে—আমার উদ্দেশে—উন্মুখর হয়ে। ডেকএর ওপর নিজেকে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে থাকি। নাঃ, আর না—আর কখনো

এমন নয়! কদাপি আর এরূপ বিপজ্জনক কাজে হাত পা দেবো না শপথ করি আপন মনে। ভগবানের দয়ায় এ যাত্রা বেঁচে গেছি খুব!

হুঁস হতে দেখলাম, একজোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে।

নীল রঙের পোশাক পরা এক খালাসী।

"ইস! ইষ্টিমার ধরা কি সোজা?" হাঁফ ছেড়ে আমি বলি, "কিন্তু ধরতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত! কী বলো খালাসী সাহেব?

খালাসীটা হাসলো, "কী দরকার ছিল বাবু এত মেহনতের? জাহাজ তো আমরা ভিড়োচ্ছিলাম জেটিতে। একটু বাদে এমনি হেঁটেই আসতেন। সবুর করলেই পারতেন একটু!"

য়্যাঁ? তখন আমার খেয়াল হল। হ্যাঁ, তাও তো হতে পারে! পাটাতন নামিয়ে জেটির গায়ে লাগানো হচ্ছিল—আমি বুঝতে পারলাম তখন।

তাকিয়ে দেখলাম, তাই। গোদাগাড়ির ইষ্টিমার আর লাল-গোলার ঘাটে আত্মীয়তা সুনিবিড়। জেঠতুতো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ততক্ষণে।

গোদাগাড়ির যাত্রীদের নিয়ে ইষ্টিমারটা পৌঁছল সেই-মাত্তর।

পরীক্ষা কী ঝকমারি

—সুনির্মল বসু

আজ সকালে খোদনের মরবার ফুরসৎ নেই! আজ স্কুলে তার শেষ পরীক্ষা।

যে সে পরীক্ষা নয়—একেবারে স্মরণশক্তির পরীক্ষা! খোদন অবশ্য সে-জন্য ভয় পায় না। সব কিছু তার একেবারে কণ্ঠস্থ-ঠোঁটস্থ-মুখস্থ! যে প্রশ্নই মাস্টার মশাই প্রশ্ন করুন একবারে গড় গড় করে বলে দেবে খোদন।

আকবর কোন্ সালে সিংহাসনে বসল, শিবাজী কি ভাবে কাকে ঠকিয়ে দিল্লীর কারাগার থেকে পালিয়ে এলো, মেঘ থেকে কি করে বৃষ্টি হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ উপায় কি কি। মাধ্যাকর্ষণ কার আবিস্কার। সুয়েজখাল কার পরিকল্পনায় খনন করা হলো, বাষ্টাইলের কি ভাবে পতন ঘটল, সতীদাহ-প্রথা কে রোধ করল, বাংলা ভাষায়

প্রথম গ্রন্থ কে ছাপলে…এসব জরুরী ও প্রয়োজনীয় খবর খোদনের মগজে কিলবিল করছে।

ঠকাক দেখি কেউ তাকে? সেটি আর হচ্ছে না! খোদনের মস্তিস্কে বহুবিধ খোপ আছে—লাইব্রেরীতে বিভিন্ন তাকে যেমন বই সাজানো থাকে। খোদনের মগজের ফোকরে ফোকরে এইসব আজগুবি প্রশ্ন আর তার জবাব মজুত করা আছে। যে কোনো র‍্যাক্ থেকে টানলেই উত্তর বেরিয়ে আসবে।

খোদন আপন মনে মুচকি মুচকি হাসে আর বিড়বিড় করে প্রশ্নের উত্তর বলে।

ওদিকে খোদনের বাড়ীতে সকাল থেকেই একেবারে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে!

শ্রীমানের বাৎসরিক পরীক্ষার আজ শেষ দিন। এই পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বাড়ীসুদ্ধ সবাই পশ্চিমে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হবে। এতদিন রওনা হয়ে যাবার কথাই ছিল, শুধু খোদনের জন্য যা আটকা। আজ ওর পরীক্ষা শেষ—তাই সবাই ঠিক করেছে শ্রীমানের পরীক্ষার পরই দল বেঁধে সবাই গংগায় ডুব দিয়ে আসবে।

সকাল থেকেই এ বাড়ীতে কাজের কামাই নেই। খোদনের মা ঘুম থেকে উঠেই চাকরকে ডেকে বলেছেন, শীগগির বাজারে চলে যা, আজকে টাটকা জ্যান্ত মাছ নিয়ে আসতে হবে। আজ খোদন মৎস্য-যাত্রা করে পরীক্ষা দিতে যাবে। জ্যান্ত মাছ দেখে রওনা হলে সুফল হাতে হাতেই পাওয়া যাবে।

ওদিকে ঠাকুমা ভোরে উঠেই মালা জপ করতে শুরু করেছেন। তিনি ঠাকুর ঘর থেকেই ডেকে বললেন। ওরে ঝি, এক খুরি চিনিপাতা দৈ এনে রাখ। ভাত-পাতে আজ দৈ খেয়ে যেতে হয়। দৈয়ের ফোঁটা কপালে থাকলে সর্ব অমংগল দূর হয়।

ঠাকুরদা বৈঠকখানা ঘরে-বসে খুকখুক করে কাশছিলেন। তিনি তাঁর গোমস্তাকে ডেকে বল্লেন,—ওরে বিরিঞ্চি, তুমি একবার এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তো—

বিরিঞ্চি এসে জিজ্ঞেস করলে—আজ্ঞে কোথা যেতে বলছেন কর্তা ?

ঠাকুরদা হুঁকোতে একটা সুখটান দিয়ে উত্তর দিলেন,—সোজা চলে যাবে কালিঘাটের মা-কালীর মন্দিরে। সেখানে আমার নিজস্ব পাণ্ডা হালদাররা আছেন। তাঁদের বলে একটা পুজো দিয়ে প্রসাদ, মালা, ফুল, বেলপাতা, জবাফুল সব নিয়ে আসবে। খোদনের পকেটে সব পুরে দিতে হবে। পরীক্ষার সময় এই সব জিনিষ থাকলে আর কোনো ভয় নেই।

বিরিঞ্চি চট করে বললে,—আজ্ঞে আমি এক্ষুণি রওনা হয়ে যাচ্ছি।

ঠাকুরদা গুরুক গুরুক করে তামাক টানতে ব্যস্ত হয়ে বললেন,—ওর পরীক্ষায় রওনা হবার আগেই ফিরে আসতে হবে কিন্তু। নইলে তোমার চাকরি থাকবে না সে কথা আমি আগেই বলে দিচ্ছি।

খোদনের ছোড়দি ঘুম থেকে উঠেই মহাকার্যে ব্যস্ত। বাড়িতে যতগুলো ফাউন্টেন পেন আছে—সবগুলি জড়ো করে সে কেবলি কালি ভরছে।

ছোট কাকা জিজ্ঞেস করলে,—হ্যারে পিণ্টু, অতগুলো কলম এক সংগে জড়ো করছিস কেন ? তোদের কলেজে কি কলমের প্রদর্শনী খুলবে না কি ?

খোদনের ছোড়দি উত্তর দিলেন—না ছোটকাকা, আজ খোদনের মনে রাখা পরীক্ষা কিনা। কিছুই তো বলা যায় না। হঠাৎ যদি কলম খারাপ হয়ে যায়। তাই বাড়ীতে যতগুলো ফাউন্টেন পেন আছে সবগুলি কালি ভরতি করে ওর পকেটে দিয়ে দেবো। ওর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একেবারে মুখস্থ কিনা। পাছে কলমের গোলমালে লিখে উঠতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ছোটকাকা বল্লে,—ঠিক ! ঠিক !

ছোড়দি আপন মনেই ফোড়ন কাটলে—হ্যাঁ, সাবধানের মার নেই ! কখন কি হয় বলা তো যায় না—।

ওদিকে দোতলার ঘরে খোদনের বড়বৌদি এক মহা সমস্যায় পড়েছেন। ট্রাংক থেকে খোদনের যত জামা কাপড় ছিল সব বের করে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন।

ধোপা ব্যাটার বিরুদ্ধে তিনি তর্জন গর্জন শুরু করে দিলেন। মেজো বৌদি হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকলেন। তিনি বড়দির মুখে ধোপার নাম শুনেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

—তুমি করলে কি বড়দি? আজকের দিনে তুমি ধোপার নাম করলে? ঠাকুমা শুনলে আর আস্ত রাখবে না কাউকে!

ততক্ষণে বড়দি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। জিব কেটে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন—ছাখ মেজো কাউকে বলিস নি যেন। আমার কি দোষ বল? কাপড় জামাগুলোর অবস্থা দেখছিস? আমি এখন কার সংগে কি মেলাই বল?

মেজো মুচকি হেসে উত্তর দিলে—কিন্তু তাই বলে তুমি সকাল বেলা ওই নাম মুখে আনবে? ভাগ্যিস নাকুন্দোর নাম উচ্চারণ করোনি! তাহলে আমি ঠাকুমাকে বলে দিতাম।

বাড়ীর বড় বৌ একটু ভালো মানুষ। সে সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকেও না। তাই আর সব বৌয়েরা বড়দিকে ক্ষেপিয়ে আনন্দ পায়। বড়দি ফিস ফিস করে মেজবৌয়ের কানে কানে বললে দেখিস্ মেজো, আবার ভুল করে ঠাকুরমার কানে কথাটা তুলিস নে। তাহলে আজ আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

ছোট বৌদি সুন্দর একটা আলপনা এঁকে ঠাকুর ঘরে মংগলঘট বসিয়ে রেখেছে। পরীক্ষা দিতে রওনা হবার সময় ঠাকুমা খোদনের মাথায় একশ আটবার দুর্গানাম জপ করে দেবেন।

ছোট বৌদির হাত সত্যি ভালো। সুন্দর আলপনা দিয়েছে ঠাকুর ঘরের মেঝেতে। ঠাকুমা খুসী হয়ে বললেন,—দিব্যি আলপনা হয়েছে। এই আলপনার ওপরকার মংগলঘটে প্রণাম করলেই খোদন পাস করে যাবে।

শুনে ছোটবৌদি খুশীতে ডগমগ। তার আলপনার জন্যে খোদন

পাস করে যাবে—একী কম যোগ্যতার কথা। চাই কি ঠাকুমার কাছ থেকে এই জন্যে কায়দা করে একটা শাড়ীও আদায় করে নেয়া চলতে পারে।

এই সময় বাড়ীর উঠোনে একটা অঘটন ঘটল। একটি বাঁধা লোক ছিল। সে মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে এসে ধূপ কাঠি দিয়ে যায়। মুশকিলের কথা লোকটি আবার মাকুন্দো। অন্য সময় হলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে সে হঠাৎ বাড়ীর উঠোনে ঢুকে হাঁক দিলে—ভালো ধূপকাঠি চাই গো—

সংগে সংগে মার মুখো হয়ে ঠাকুমা তেড়ে এলেন, হ্যাগো বাছা তুমি আর ধূপকাঠি বেচবার দিনক্ষণ পেলে না! একেবারে আজ সক্কালেই হাজির হয়েছ? ঠাকুমার হুমকি শুনে ধূপকাঠিওলা তো একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল।

—কেন মা ঠাকুরণ কী দোষ করেছি আমি? ঠাকুমা আবার তেলে বেগুনে হয়ে উঠলেন—দোষ করো নি তুমি? ওই মুখখানা কি আজকে তোমার না দেখালেই নয় বাছা? না হয় ধূপকাঠি আজ বিক্রি না-ই করতে!

—আচ্ছা তাহলে আমি যাচ্ছি মা-ঠান! কিন্তু ধূপকাঠিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না। ও রইলো তোমাদের ঠাকুরঘরের দাওয়ায়।

এক বাণ্ডিল ধূপকাঠি রেখে দিয়ে লোকটি পালাতে পথ পায় না!

তারপর খোদনের জয়যাত্রার পথ! কেউ নির্মাল্য এনে দিচ্ছে, কেউ দৈয়ের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছে কপালে, কেউ ফাউণ্টেনপেনের অস্ত্রে সাজিয়ে দিচ্ছে। ঝি চাকরের দল জামা জুতো, আয়না চিরুনি নিয়ে একেবারে তটস্থ!

ঠাকুরদা গুরুক গুরুক তামাক টানছেন আর বলছেন—বিরিঞ্চি কি গিয়ে মরে রইলো না কি?

হন্তদন্ত হয়ে এমন সময় বিরিঞ্চি এসে হাজির। তার হাতে প্রসাদ আর জবাফুলের মালা। ঠাকুমা এসে প্রসাদ খাইয়ে দিলেন।

ঠাকুরদা জবাফুলের মালাটা পরিয়ে দিলেন গলায়। খোদন কাঁদ

কাঁদ সুরে বললে এই জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে আমি কি করে স্কুলে যাবো ? রাস্তার ষাঁড় আমাকে তাড়া করবে যে !

তখন বড় বৌদি এগিয়ে এসে মালাটা তার বুক পকেটে গুঁজে দিলে।

দুর্গা দুর্গা শব্দে খোদন যেন বিশ্ব জয় করতে রওনা হলো। এমন সময় চৌকাঠের ওপর টিকটিকিটা ডেকে উঠলো টিক্-টিক্-টিক্—

ঠাকুমা বলে উঠলেন—মা মংগলচণ্ডী, সবদিক রক্ষা করো মা—

যতক্ষণ খোদন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে না আসছে বাড়িসুদ্ধ প্রাণী কেহ জলগ্রহণ করবে না! শুধু খোদনের ছোট বোনটা লুকিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে গোটা চারেক মাছ ভাজা খেয়ে এলো।

অবশেষে একটার পর খোদন এসে হাজির হলো। সারা হাতে কালি মাখা, জামায় কালি কলমের মুখগুলো নাকি বেমক্কাভাবে খুলে গিয়েছিলো।

ঠাকুরদা বললেন,—তা হোক! বেশী লিখলে এমন হয়েই থাকে। তা ভাই খোদন কটা প্রশ্নের উত্তর লিখলে? খোদন ঠাকুরদার মুখে এই প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল।

তারপর দুটো চোখ বড় বড় করে মাথা চুলকে খোদন উত্তর দিলে, —মানে আজকে আমার স্মরণশক্তির পরীক্ষা কিনা! দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। আর—এই যাঃ আর একটা প্রশ্নের কি উত্তর লিখেছি—বেমালুম ভুলে গেছি !

ঠাকুরদার হাত থেকে হুঁকোটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মেঝেময় জল গড়িয়ে পড়ল।

ঠাকুমা এগিয়ে এসে টিপ্পনী কাটলেন—ওই মাকুন্দো লোকটা যখন উঠোনে এসে ঢুকল, তখুনি বুঝেছি একটা অনর্থ হবে।
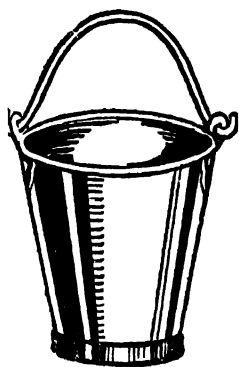
নীতিবতী ভুলুর জেঠী

—আশাপূর্ণা দেবী

বালতি। বালতি!

সকাল থেকে বেলা দশটার মধ্যে অন্ততঃ বারশো বাহান্ন বার কথাটা উচ্চারিত হয়েছে ভুলুদের বাড়ীতে! উচ্চারণ করেছেন ভুলুর জেঠী। কারণ তার একটি বালতি হারিয়েছে!

বারশো বাহান্ন বারের পর আবার নতুন উৎসাহে সুরু করলেন তিনি "বালতি আমার চাই-ই চাই! যে নিয়েছে সে যদি ভালোয় ভালোয় না দেয় তো—"

ভুলুর বাবা চেঁচামেচিতে কাতর হয়ে এসে বলেন, "বাড়িতে তো বালতির অভাব নেই বৌদি, কেন আর সামান্য একটা বালতির জন্য এতো ”

ভুলুর জেঠী ঝংকার দিয়ে ওঠেন, "কী যে বল ছোট ঠাকুরপো! বেশী আছে বলে, যে পাবে সে চুরি করবে? চুরিকে প্রশ্রয় দেব না আমি। একটা ছুঁচ চুরি গেলেও রসাতল করে ছাড়বো।"

ভুলুর বাবা হতাশ হয়ে সরে গিয়ে ভুলুর জেঠাকে পাঠিয়ে দেন। তিনি রান্নাঘরের দিকে আসতে আসতে শুনতে পান ভুলুর জেঠী তখনো চেঁচাচ্ছেন 'রাত্তিরে দেখেছি সিঁড়ির তলায় বালতিটা পড়ে, সকালে অমনি হাওয়া! এ কি মগের মুলুক না কি?"

ভুলুর জেঠা এসে চুপি চুপি বলেন, "একটা বালতির জন্যে চেঁচামেচি করে শরীর খারাপ করছো কেন? একে তোমার মাথা

ধরার ধাত। ক'টা বালতি তোমার চাই বলো না? বালতিতে বাড়ি ভর্তি করে দেবো।"

কথাটা বলে এমন একটি রহস্যময় হাসি হাসেন ভুলুর জেঠা, মনে বুঝি ফুস্‌মন্তরে বালতি বানানোর কায়দাই জানা আছে তার। ভুলুর জেঠী কিন্তু এ হাসিতে ভোলেন না, রেগে মেগে বলেন, "সে তুমি একশোটাই এনে দাও না কেন, তা বলে চুরি বরদাস্ত করবো? কক্‌খনো না! কে বালতি নিয়েছে, সে কথা বার করে ছাড়বো আমি!"

ভুলুর জেঠা নিরুপায় মুখে বলেন, "আহা-হা, কেউ নিয়েইছে তাই ভাবছো কেন? এমনি হারিয়ে যেতে পারে না?"

"এমনি হারিয়ে যাবে?" ভুলুর জেঠী তপ্ত খোলায় জল ছিটোনোর মতো চিড়বিড়িয়ে ওঠেন, "এমনি হারিয়ে গেলেই হ'ল? বালতির পা আছে? বল, বল আছে পা?"

ভুলুর জেঠা সভয়ে মাথা নাড়েন।

"নেই! স্বীকার করছো তা'হলে? বলি—বড় বড় দু'খানা ডানা আছে বালতির?"

ভুলুর জেঠা আর একবার মাথা নাড়েন।

"হুঁ, তা'হলে বলো, নিজেই বলো হারাবে কি করে! পা নেই যে হেঁটে চলে যাবে, ডানা নেই যে উড়ে চলে যাবে।"

ভুলু বসে বসে আম খাচ্ছিল, হাত চাটতে চাটতে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "বোধহয় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে জেঠীমা।"

"তুই থামতো ফ্যাজল কেষ্ট—" বকে ওঠেন ভুলুর জেঠী। তারপর বাড়ির ঠাকুর চাকর আর বাসন মাজা ঝি ক্ষ্যান্তকে ডেকে ঘোষনা করেন—"এই তোমাদের ওপর ভার, কালকের মধ্যে যদি বালতি না পাই তো সব্‌বাইকে জেলে দেব।"

মাত্র একটা বালতি হারানোর কেস্‌এ তিন তিনটে আস্ত লোককে জেলে দেওয়া যায় কি না এ তর্ক কেউ করে না ভুলুর জেঠীর সঙ্গে, কারণ রাগলে আর তার জ্ঞান থাকে না। হয় তো যে তর্ক করতে যাবে, তাকেও থানায় চালান দিতে চাইবেন।

ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো একটু পরেই হঠাৎ ভুলুর জেঠার মেজ দাদা এসে হাজির হ'লেন আসানসোল থেকে। বালতি প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল, দাদার আদর অভ্যর্থনার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মহিলা।

ভুলুর জেঠাও বড়কুটুম্বের তোয়াজ করেন, "তাপর মেজদা, আমাদের তো ভুলে গেছেন। কতোদিন পরে এলেন!"

মেজদা টাক চুলকে বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—তা' অনেকদিন পরে বটে। অসলে কি জানো ভায়া, ইচ্ছে যে করে না তা' নয়, তবে কি না এলেই তো খরচা—"

হা হা করে হেসে ওঠেন ভুলুর জেঠা "ওঃ কী খরচ! আসানসোল একেবারে বিলেত! কতো গাড়িভাড়া?"

মেজদা টাক দুলিয়ে দুলিয়ে বলেন, "কমই বা কি বাপু! যেতে আসতে কমই বা কি? আমার তো আর তোমার মত রেল অফিসে চাকরী নয়; যে রেল কোম্পানীর পয়সায় দেশভ্রমণ করে বেড়াবো?"

ভুলুর জেঠা হাস্যবদনে বলেন, "তা বটে!"

"তারপর? চাকরীতে উন্নতি টুন্নতি হলো আরও?"

"তা আপনাদের আশীর্বাদে! ঘুরে বেড়ানোর কাজটা বদলেছে। এখন এই কাঁচড়াপাড়াতেই স্থিতি। 'স্টোরকীপার' করে দিয়েছে।"

"ও তাই নাকি! ভালো ভালো! এখানে জিনিসপত্র এখনো সেই রকম—মানে আগের মতন সস্তা আছে?"

ভুলুর জেঠা হাত উল্টে বলেন, "কোথায়? বাজার আগুন! তবে আমাদের আমাদের কথা আলাদা! আমাদের—যতোদিন এই কোম্পানীর চাকরীটি আছে, ততোদিন তোফা আছি।"

ভুলু ডাকতে এলো, "জেঠামশাই, মা বললেন তোমার শালাকে ডেকে নিয়ে যেতে, ভাত দিয়েছেন।"

জেঠামশাই রেগে ওঠেন, "কী অসভ্যের মত কথাবার্তা শিখেছো? গুরু লঘু জ্ঞান নেই? যাকে যা হোক বললেই হ'লো?"

ভুলু সভয়ে একবার জেঠার মেজদার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললো,

"যাকে যা হোক! তবে যে মা বললো 'উনি জেঠামশাইয়ের শালা'।"

"ঠিক বলেছেন, তোমার মা ঠিক বলেছেন", বলে মেজদা হাসতে হাসতে খেতে যান।

কিন্তু হায়! হায়! খাওয়ার সময় যে হাসি খুসি সব ঘুচে যাবে কে জানতো! ঘুচে যাবে মানে ভুলুর জেঠাই ঘুচিয়ে দিলেন। তবে মূল কর্মকর্তা চাকর ভজহরি।

ওঁরা যখন সবে সুক্তটি শেষ করে ডালের বাটিতে হাত দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে—

হ্যাঁ ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ ক্ষ্যান্ত ঝিয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ভজহরির ঘটনাস্থলে এক নাটকীয় আবির্ভাব!

"মা, এই দেখুন! দেখে এলাম ক্ষেন্তির বাড়িতে সেই ছাপমারা বালতি।"

"অ্যাঁ!"

সকলেই চমকে উঠলেন!

সত্যি চমকাবারই কথা। সকালে এতো কাণ্ডকারখানা হ'ল একবার বললো না যে 'আমি নিয়েছি'। ভুলুর জেঠী হাত থেকে ঝালের মাছের কাঁসি মাটিতে নামিয়ে রেখে তেড়ে যান, আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে!

"একেবারে পাকা চোর!"

বহুবিধ জেরার পর ভুলুর জেঠী এঘরে এসে মন্তব্য করেন, "তা নইলে কখনো এতো বুকজোর! সকালে অতো বকাবকি করলাম, একেবারে চুপ! আবার এখন বলে কি না 'ফিরিয়ে দিয়ে যাবো—'! শোনো আসপদ্দার কথা, ওর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া জিনিস, আমি ফের নেবো!! বলে দিলাম এখখুনি মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি চলে যা ক্ষেন্তি, আর এ মুখো হ'বি না!"

ক্ষ্যান্ত লোভের বশে একটা কাজ করে ফেলে এখন হাতে পায়ে ধরতে সুরু করে। "আর ককখুনি এমন কাজ করবোনি মা, আপনার

তো চাদ্দিকে চব্বিশটা বালতি, ভাবলাম একটা নিলে কিছু আটকাবেনি। ওদিকে আমার বালতিটা একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে—"

"বটে বটে! খুব যে যুক্তি দেখাচ্ছিস, তোর পরনের কাপড়খানাও তো ঝাঁজরা হয়ে গেছে দেখছি, নিয়ে যা আমার আলমারি খুলে খানকতক শাড়ী।"

ক্ষ্যান্ত অগত্যা শেষ উপায়স্বরূপ কান্না ধরে।

কিন্তু ভুলুর জেঠী তা'তে টলেন না, 'চোরের কান্নায়' তাঁর মন গলে না।

ভুলুর বাবা বলেন, "এবারটার মতো না হয় ওকে মাপ করো বৌদি, কান্নাকাটি করছে—"

ভুলুর জেঠী বকে ওঠেন, "তুমি থামো ছোটঠাকুরপো, ওসব হচ্ছে মায়া কান্না।"

ভুলুর মা এসে কাতর ভাবে বলেন, "ক্ষ্যান্তকে ছাড়ালে কে বাসন মাজবে দিদি? লোকজন তো পাওয়া যায় না।"

ভুলুর জেঠী গম্ভীর চালে বলেন, "না পাওয়া যায়, নিজেরাই মাজতে হবে! তা বলে বাড়িতে চোর পুষে রাখতে পারবো না।"

অগত্যা এ বাড়ি থেকে ক্ষ্যান্তর অন্ন উঠল!

ভুলুর বাবা বললেন, "কাজটা ভাল হলোনা, গরীব মানুষ!"

ভুলুর জেঠী অগ্নিমূর্তি হয়ে বলেন, "গরীব মানুষ! গরীব মানুষ তা' কি? গরীব বলে কি মাথা কিনেছে? তাই চুরি করে পার পেয়ে যাবে? আমার বাড়িতে আমার সংসারে, কোন অন্যায় চলবে না ঠাকুরপো! এই বলে দিচ্ছি!"

ভুলুর জেঠীর মেজদা, এই সব গণ্ডগোলে হাঁ হয়ে বসেছিলেন, এবারে আর থাকতে না পেরে বলে ওঠেন, "কিন্তু থেঁদু, মাছের ঝালটা?"

থেঁদু, অর্থাৎ ভুলুর জেঠী এবার লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি কাঁসিটা

তুলে নিয়ে ভাইয়ের পাতে একসঙ্গে চারখানা মাছ ফেলে দিয়ে বলেন, "দেখনা মেজদা, এই সময় যত ঝঞ্ঝাট !"

"তা' ঝঞ্ঝাট তো আরও বাড়ালি—" মেজদা কাঁটাসুদ্ধ আস্ত একখানা মাছ মুখের মধ্যে পুরে ফেলে বলেন, "ওই যে ঝি না কা'কে যেন ছাড়িয়ে দিলি ?"

"তা' কী করবো !" ভুলুর জেঠী গম্ভীর ভাবে বলেন, "তা' বলে বাড়িতে চোর পুষে রাখবো ?"

মেজদা মহোৎসাহে বলেন, "তা' সত্যি, আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সব কটা বিদেয় করে দিই, কিন্তু ঠক্ বাছতে যে গাঁ উজোড় ! আমার ওদিকের চাকর বাকর গুলো তো একেবারে চোরের রাজা ! এই শুধু তোর মেজদাটিকে বাদে, বাড়ির সর্বস্ব চুরি করছে। ঘড়ি ফাউণ্টেন পেন সিগারেট কেস মনিব্যাগ এ সব তো সর্বদাই যাচ্ছে। তা'র ওপর আবার একদিন দেখি কিনা বাসনওলা ডেকে বাড়ির বাসনগুলোই বেচে দিচ্ছে !"

থেঁদুরানী গালে হাত দিয়ে বলেন, "বল কি মেজদা, এ তো চোর নয় ! এ যে একেবারে ডাকাত ! বাড়িতে এই রকম লোক পুষে রেখেছ তুমি ?"

"কি করবো ?" মেজদা উদার ভাবে বলেন, "ছাড়ালে পরেরটা আরো পাকা চোর হবে কি না। আমার গলায় ছুরি দেবে কি না।"

"অত ভাবলে চলে না।" থেঁদু বলেন, "আমি ওসব সহ্য করতে পারি না। ইচ্ছে হয় অভাব হয়, বলে চেয়ে নেবে, না বলে নেবে কেন ?"

বিকেল বেলা মেজদাকে নিয়ে ভুলু বেরোল বেড়াতে। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় কাঁচড়াপাড়ার দ্রষ্টব্য হিসেবে প্রায় কাশ্মীরের কাছাকাছি। বকে বকে আর বকিয়ে বকিয়ে, হেঁটে হেঁটে আর হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে ভুলু যখন ভদ্রলোককে ফের ফিরিয়ে আনে তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভুলুর বাবা আর জেঠামশাই অফিস থেকে ফিরেছেন।

ভুলু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, "এই সেরেছে ! বাবা এসে

গেছে! মেজ-মামা, বাবা যদি আমাকে এখনো পড়তে বসিনি বলে বকে, আপনি বলবেন আপনার খুব বেড়াতে ভালো লাগছিল বলে এতো দেরী হয়ে গেল।"

মেজমামা গম্ভীর মুখে বলেন, "কিন্তু আমার তো ভালো লাগছিল না! তুমিই তো—"

"আঃ কী মুস্কিল! সত্যি কথা বললে বাবার কাছে পিটন চণ্ডী খেতে হবে যে!"

বাড়ি ঢুকে বোনের ঘরে এসে মেজমামা একেবারে হাঁ হয়ে যান। আর হাঁ হ'বার কথাও। ঘরে খেঁতুর শোবার চৌকীর ওপর ছু' ছুটো ঝকঝকে নতুন প্রকাণ্ড বালতি! জলে টই টুম্বুর!

শোবার ঘরে চৌকীর ওপর জলভর্তি বালতি! পাগল না কি?

মেজদা অবাক হয়ে বলেন, "কী হে ব্যাপার কি?"

ভুলুর জেঠা হতাশ মুখে বলেন, "আর ব্যাপার! সব চেষ্টাই বৃথা মেজদা! অফিস যাবার সময় সেই বুড়ি ঝিটা রাস্তায় আমার পায়ে ধরাধরি, 'এবারকার মতন মাপ করুন বড়বাবু—' তাই ভাবলাম। একটা মাত্তর বালতির জন্মে এতো, আপনার বোনের মেজাজ ঠাণ্ডা করতে একেবারে এক জোড়া বালতিই আমদানী করি। মেজাজের আগুনে জল ঢালতে একেবারে ভরেই এনে সামনে বসিয়ে দিলাম, কিন্তু কিছুই হ'ল না! সেই এক বুনো গোঁ। আপনার বোনের 'বাড়িতে চোর পুষে রাখবেন না।' বেচারা বুড়িটা!"

মেজদা পা ছুটো টান টান করে চেয়ারে বসে একটি এক টন ওজনের হাই তুলে বলেন, "তাই তো! তোমার শুধু শুধু কতকগুলো পয়সা খরচাই সার!"

জগতের প্রত্যেকটি ব্যাপারে মেজমামার প্রথম দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ওই 'পয়সা খরচা'র ওপর! ভুলুর জেঠা হেসে ওঠেন। "আপনার তো খালি ওই চিন্তা! তা' হ'লে ভেতরের কথা বলি পয়সা আমার খরচা হয়নি হে মেজদা, হয়ও না। আপনাদের আশীর্বাদে সংসারের অর্ধেক জিনিসেই পয়সা লাগে না। এ সব হলো গে রেল কোম্পানীর মাল,

না বলে চেয়ে আনা—" গলাটা নামিয়ে একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলেন ভুলুর জেঠা—"যতো দিন এই কোম্পানীর চাকরীটি আছে, তোফা আছি বুঝলেন দাদা। তাইতো আপনার বোনকে বলছিলাম একটা বালতি হারিয়ে এতো কষ্ট পাচ্ছো? ক'তো বালতি চাও? কিন্তু বললাম তো আপনার বোনের ওই এক বুনো গোঁ 'বাড়িতে চোর পুষে রাখবো না'! নীতিজ্ঞানটা খুব বেশী তো!"
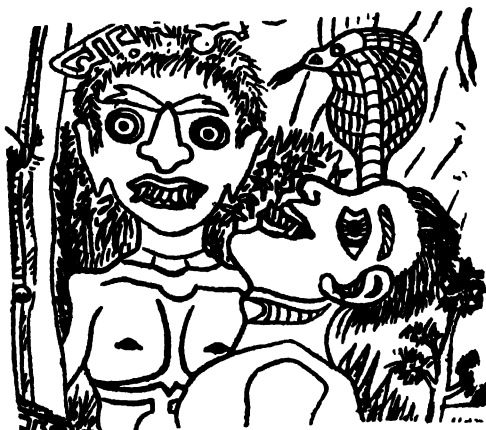
পেনেটিতে

—লীলা মজুমদার

পেনেটিতে, একেবারে গঙ্গার ধারে, আমার বড়মামা একটা বাড়ি কিনে বসলেন। শুনলাম বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব, তাই কেউ সেখানে থাকতে চায় না। সেইজন্য বড়মামা ওটাকে খুব শস্তাতেই পেয়েছিলেন।

যাই হোক, বিয়ে-টিয়ে করেন নি, আপত্তি করবার লোকও ছিল না। মেজমাসিমা একবার বলেছিলেন বটে, 'নাইবা কিনলে দাদা, কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেউ থাকেনা কেন?'

বড়মামা রেগেমেগে বাড়ির কাগজপত্র সই করবার আগে ওঁদের কুস্তির আড্ডার দু-জন ষণ্ডাকে নিয়ে সেখানে দিব্যি আরামে দু-রাত কাটিয়ে এলেন। ষণ্ডাদের অবিশ্যি সব কথা ভেঙে বলা হয় নি। তারা দু-বেলা মুরগি খাবার লোভে মহা খুশি হয়েই থাকতে রাজি হয়েছিল। পরে আড্ডায় ফিরে এসে যখন বড়মামা ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন তখন তারা বেজায় চটে গিয়েছিল। 'যদি কিছু হত দাদা? গায়ের জোর দিয়ে তো ওনাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যেত না!'

দু-মাস পরে বড়মামা সেখানে রেগুলার বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে গেল বঙ্কুঠাকুর, তার রান্না যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভোলে নি, আর গেল নটবর বেয়ারা। তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, রোজ সকালে বিকেলে আধ ঘণ্টা করে দুটো আধমনি মুগুর ভাঁজে। আর ঝগড়ু জমাদার, সে চার পাঁচবার জেল খেটে এসেছে গুণ্ডামি টুণ্ডামির জন্য। এরা কেউ, শুধু ভূত কেন ভগবানেও বিশ্বাস করে না।

আমরা বরানগরে ছিলাম, আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি। এমন সময় বাবা পাটনা বদলি হয়ে গেলেন আর আমার স্কুল নিয়েই হল মুস্কিল। বড়মামা তাই শুনে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, এমন কিছু দূরও পড়বে না। ব্যাটা বঙ্কুর রান্না খাবে আর আমিও আমার নতুন কবিতাগুলো শোনাবার লোক পাব, বন্ধুরা তো আজকাল আর শুনতে চায় না। ভালই হল।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। মা-রা যেদিন সকালে পাটনা চলে গেলেন, আমার জিনিসপত্র বড়মামার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর আমিও সারাদিন স্কুল করে বিকেলে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম।

মনটা তেমন ভাল ছিল না। মা-রাও চলে গেছেন আর আমাদের ক্লাসের জগু ভুটে বলে দুই কাপ্তেন কিছুদিন থেকে এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে স্কুলে টেকা দায় হয়ে উঠেছিল। আগে ওরাই আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড ছিল, কিন্তু পুজোর ছুটির সময় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা এমন পয়ে আকার ছোটলোকের মত ব্যবহার আরম্ভ

করেছিল যে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওঁরাই হলেন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, ক্লাবের সেক্রেটারি। সেদিনও ওদের সঙ্গে বেশ একটা কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, সে আবার অঙ্ক ক্লাসে। আমার একার দোষ নয়, কিন্তু ধরা পড়ে বকুনি খেলাম আমিই। ওরা দেখলাম খাতার আড়ালে ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করে হাসছে।

বাড়ি এসেও মনা টএকটু খারাপ ছিল। একেবারে জলের মধ্যে থেকে ঘাটের সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। বিশাল বিশাল ঘর ঝগড়ু আর নটবর তকতকে করে রেখেছে। প্রায় সবগুলিই খালি, শুধু নিচের তলায় বসবার ও খাবার ঘরে আর দো-তলায় তুটো শোবার ঘরে বড়মামা কয়েকটা দরকারি আসবাব কিনে সাজিয়েছেন।

কেউ কোথাও নেই। বড়মামাও কোথায় বেরিয়ে গেছেন। নিচে থেকে বন্ধুর রান্না লুচি আলুরদম খেয়ে উপরে গেলাম। বই রেখে, আমার ঘরের সামনের চওড়া বারান্দা থেকে দেখি বাগানময় ঝোপঝাপ; কাঁঠালগাছও গোটাকতক আছে। গঙ্গার ধার দিয়ে জবাফুলের গাছ দিয়ে আড়াল-করা একটা সরু রাস্তা একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁসে চলে গেছে। সেখানে তিনজন মাঝিগোছের লোক মাছ ধরার ছিপ সারাচ্ছে। একজন বুড়ো আর তু-জন আমার চেয়ে একটু বড় হবে। ওখানকারই লোক বোধ হয়। আমাকে দেখতে পেয়ে তারা নিজের থেকেই ডাকল। দেখতে দেখতে বেশ ভাব জমে গেল। ওরা বললে পিছনদিকের পুকুরে আমাকে মাছ ধরা শেখাবে, শনিবার নদীতে জাল ফেলবে, নিশ্চয় নিশ্চয় যেন আসি। বুড়োর নাম শিবু, ছেলেতুটো ওর ভাইপো, সিজি আর গুজি।

বেশ লোকগুলো। বাড়ির মধ্যে আসত-টাসত না, চাকর-বাকরদের এড়িয়ে চলত, কিন্তু আমার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম হয়ে গেল। আমাকে সাপে কামড়ানোর ওষুধ, বিছুটি লাগার ওষুধ এইসব শিখিয়ে দিল। আমাদের বাগানেই পাওয়া যায়।

মামা মাঝে মাঝে খুব রাত করে বাড়ি ফিরতেন আর দোতলায় একা-একা আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। শিবুদের কাছে

সে কথা জানাতেই, যেদিনই মামা বেরোতেন সেদিনই ওরা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে, বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে কত যে গল্প করত তার ঠিক নেই। সব মাঝিদের গল্প, ঝড়ের কথা, নৌকোডুবির কথা, কুমির আসার কথা, হাঙর মারার কথা, সমুদ্রের কথা।

ওদিকে স্কুলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এমন হল যে, ঐ জগু, ভুটে আর নেলো বলে ওদের যে এক শাকরেদ জুটেছে এই তিনজনকে অন্তত আচ্ছা করে শিক্ষা না দিলে চলে না। শিবু বললে, 'বাবু, এইখানে ডেকে এনে সবাই মিলে কষে পিটুনি লাগাই।'

বললাম, 'না রে, শেষটা ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে! তার চেয়ে এখানে এনে এমনি ভূতের ভয় দেখাই যে, বাছাধনদের চুলদাড়ি সব খাড়া হয়ে উঠবে।' তাই শুনে ওরা তিনজনে হেসেই লুটোপটি।

আমি বললাম, 'ছাখ্, তোদের তিনজনকে কিন্তু ভূত সাজতে হবে আর আমি ওদের ভুলিয়ে ভালিয়ে আনব। তোদের সব সাজিয়ে-গুজিয়ে দেব।'

'অ্যাঁ! সেজিয়ে গুছিয়ে দেবেন কেনে বাবু? রঙটা মেলিয়ে দেবার দরকার হবে না। তিনটে চাদর দেবেন। আমরা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে, গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে এমনি এমনি করে হাত লাড়তে থাকব আর ওঁ ওঁ শব্দ করব, দেখবেন ওনাদের পিলে চমকে যাবে।' ছেঁড়া চাদর, ধুতি যা পেলাম তিনটে দিয়ে দিলাম। সত্যি ওদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। ভালই হবে, তাহলে আমাকে কেউ সন্দেহও করবে না, বাড়িটার একটা অপবাদ তো আছেই।

শুক্রবার ইস্কুলে গিয়ে জগু ভুটেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। বাবা! ওদের রাগ দেখে কে! 'কিরে হতভাগা, ভারি লাট সায়েব হয়েছিস যে! কথা বলছিস না যে বড়?'

বললাম, 'মেয়েদের সঙ্গে আমি বড় একটা কথা বলি না। ব্যাচেলর মামার শিক্ষা।' তারা তো রেগে কাঁই!

'মেয়েদের সঙ্গে মানে? মেয়েদের আবার কোথায় দেখলি?'

বললাম, 'যারা ভূতের ভয়ে আমাদের বাড়ি যায় না, তাদের সঙ্গে মেয়েদের আবার কী তফাত?'

জগু রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বললে, 'যা মুখে আসবে, খবর্দার বলবি না গুপে!'

'একশো বার বলব, তোরা ভিতু, কাপুরুষ, মেয়েমানুষ!' জগু আমাকে মারে আর-কি! শুধু অঙ্কের মাস্টারমশাই এসে পড়লেন বলে বেঁচে গেলাম।

স্কুল ছুটির সময় ভুটে পিছন থেকে এসে আমার কানে কানে বললে, 'সন্ধেবেলা সাতটার সময় তোমাদের বাড়ির বাগানে আধঘণ্টা ধরে আমরা বেড়াব। দেখি তোমাদের ভূতের দৌড় কতখানি! হুঁ, আমাদের চিনতে এখনও তোমার ঢের বাকি আছে!'

আমি তো তাই চাই; শিবুরা আজকের কথাই বলে রেখেছিল।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরলাম, ওদের দেখতে পেলাম না। একটু একটু নার্ভাস লাগছিল, যদি ভুলে যায়। নদীর ধারে একটা ঝোপের পিছন থেকে গুজি ডেকে বললে, 'বাবু, সব ঠিক আছে আমাদের।' জগু ভুটে নেলো তিন কাপ্তেন এসে হাজির।

বড় মামা বেরোচ্ছিলেন, ওদের দেখে আমাকে বললেন, 'বন্ধুদের কেষ্টনগরের মিষ্টি-টিষ্টি দিস, সব একা একা খেয়ে ফেলিস না যেন।' কথাটা যেন না বললেই হত না! ওরা তো হেসেই গড়াগড়ি। যেন ভারি রসিকতা হল।

বড়মামা গেলে, খাওয়া দাওয়া সেরে বাগানে গেলাম। এক্ষুনি বাছারা টের পাবেন! চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু একটু চাঁদের আলোতে সব যেন কিরকম ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছে, আমারই গা ছম্‌ছম্ করছে। গল্প করতে করতে ওদের গঙ্গার ধারের সেই সরু রাস্তাটাতে নিয়ে এলাম। বাড়ি থেকে এ জায়গাটা আড়াল করা। পথের বাঁক ঘুরতেই আমার শুদ্ধ গায়ে কাঁটা দিল—ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি! মাথা মুখ হাত সব ঢাকা, আবার হাত

তুলে তুলে যেন ডাকছে আর অদ্ভুত একটা ওঁ ওঁ শব্দ! একটু একটু হাসিও পাচ্ছিল।

জগুরা এক মিনিটের জন্যে ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে—'তবে রে হতভাগা! চালাকি করবার আর জায়গা পাস নি!' বলে ছুটে গিয়ে চাদর-শুদ্ধ মূর্তিগুলোকে জাপটে ধরল।

তার পরের কথা আমি নিজের চোখে দেখেও যখন বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমরা আর কী করে করবে? ছোঁবা-মাত্র মূর্তিগুলো যেন ঝুর-ঝুর করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, শুধু চাদর তিনটে মাটিতে পড়ে গেল।

জগু, ভুটে, নেলোও তক্ষুনি মূর্ছা গেল।

আমি পাগলের মত 'ও শিবু, ও সিজি, ও গুজি' করে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আর গোলযোগ শুনে বঙ্কু, নটবর আর ঝগড়ু হল্লা করতে করতে এসে হাজির হল। ওরা জগুদের তুলে, ঘরে নিয়ে গিয়ে, চোখে মুখে জল দিল। আমার মাথায়ও মিছিমিছি এক বালতি জল ঢালল।

মামাকেও পাড়া থেকে ডেকে আনা হল। এসেই আমাকে কী বকুনি!

'বল্ লক্ষ্মীছাড়া, চাদর নিয়ে গিয়েছিলি কেন?'

যত বলি শিবু সিজি গুজির কথা, কেউ বিশ্বাস করে না।

'তারা আবার কে? এতদিন আছি, কেউ তাদের কোনও দিনও দেখেনি শোনে নি; এ আবার কী কথা? আন্ তাহলে তাদের খুঁজে।'

কিন্তু তাদের কি আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায়? তারা তো আমার চোখের সামনে ঝুর-ঝুর করে কর্পূরের মত উবে গেছে।

ডাক্তার, ডাক্তার !

—শ্রীমতী বাণী রায়

ওই যে ছোট হলদে বাড়ীখানার পাশ দিয়ে বাঁকা রাস্তাটা বা'র হয়েছে, মোড় ফিরলেই তুমি পাবে সেই বিরাট লাল-টুকটুকে বাড়ীখানা। তেতলা বাড়ী। গ্যারেজে মোটরও আছে। অনেকগুলো ঝি-চাকর ঘোরাফেরা করছে, দেখা যায় বাইরে থেকেই।

বেশ বড়লোকের বাড়ী বোঝা যায় সহজে। কিন্তু ওই বাড়ীর মালিক মোটেই বড়লোক ছিল না। ত্ব'বেলা পেটভরে খেতে পেত না সে এতই গরীব ছিল।

তা'হলে লেখাপড়া করে মানুষ হয়েছে বুঝি? পরে টাকাকড়ি করেছে নাকি?

না তো। লেখাপড়া বেশী করেনি। ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারেনি। জমিদারী সেরেস্তার কেরানী বাবা আর পড়াতে পারেনি।

তবে হাতের কাজ শিখেছে বুঝি, নাকি ব্যবসা করে বড়লোক?

হাতের কাজের মধ্যে দিনরাত বসে বসে তাস খেলে। ব্যবসার ধারে-কাছে যাবে কখন? ঘুম থেকে ন'টায় ওঠে। হাতের কাছে চা-বিস্কিট ধরে দিয়ে খাস-চাকর ডাকে, "হুজুর, উঠুন।"

উঠে চা খেয়ে একটু খবরের কাগজ পড়ে নেয়। বসার ঘরে

আলমারী ভর্তি বাঁধানো নামী ও দামী বই থাকলেও পড়াশোনা সারা দিনে ওইটুকু।

তারপর তেল মাখতে বসে ছেঁড়া কাপড় পরে। চাকর তেল মাখায়, ডলাই-মলাই করে। তখন ছেলেমেয়েরা যার-যা চাহিদা এসে কানের কাছে শোনায়। সেক্রেটারী বা সরকারমশাই আসেন। সংসারের খরচ, হিসাবপত্রের আলোচনা চলে। তারপরে মার্বেলের মেজে থেকে উঠে যায় বাথরুমে। শাওয়ার-বাথ, জলের টাব মজুদ সেখানে। স্নান সেরে এলে স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি, বাদাম-মিছরির সরবৎ, সেদ্ধকরা একটা আপেল, সরের ভাজা ছানার কাঁচাগোল্লা এনে রাখে। গল্পগুজব করে। তারপর বার হয় একটু বিষয়সম্পত্তির তদারকে, ব্যাঙ্কে, এখানে ওখানে। ফিরে এসে একটায় আহার। পোলাও রোজ চাই, শাদা মিহিচালের ভাতের সঙ্গে। দু'তিন রকম মাছ চাই। ডাল, তরকারী, ভাজা, চাটনী, কি নয়? তারপরে দই, ক্ষীর দুই-ই চাই। অতঃপর ডানলোপিলোর গদিতে শুয়ে ঢালাও কয়েক ঘণ্টা দিবানিদ্রা। সন্ধ্যেবেলা চা নিয়ে আবার চাকরের হাঁক, "হুজুর, উঠুন, সন্ধ্যে হ'ল।" উঠে বসে চা-খায় সন্ধ্যেবেলা আর কিছু আহার নয়, শুধু একগ্লাস ঠাণ্ডা-করা রেফ্রিজারেটরের ঘোলের সরবৎ ও একগোছা আঙুর। আর বার হয় না বাড়ী সে থেকে। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা গুহার মত ঘরে বসে থাকে একতলায়। আসল সময় সেইটা। তার কাছে নানারকম লোক আসে। সেই সময়ে তার স্ত্রী-পুত্রপরিবার গাড়ী নিয়ে বেড়ায়। রাত্রি ন'টায় আবার খাবার তৈরি। এবেলা লুচি-মাংস বা পরোটা-রোষ্ট, চপ-কাটলেট, ডেভিল ইত্যাদি। সঙ্গে নানারকম মিষ্টান্ন। খাবার পরে রেডিও শোনে বা লেট্-শোতে সিনেমা যায়। তারপর খাস-চাকর একটা জরির আলোবলাদার রুপোর গড়াগড়া এনে দেয়, পা টেপে ব'সে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

এই জীবন তার। ব্যায়াম করে না, যা-খুশী খায়, মাথাটিও ধরে না জীবনে।

আহা, সুখের জীবন একেই বলে! কিন্তু এই টাকাকড়ি, ধনসম্পত্তির উৎস কোথায়? তবে বুঝি সেই লোকগুলোর সাহায্যে শেয়ার মার্কেট বা ফাট্‌কা-খেলা চলছে?

কিন্তু লোকগুলিকে লক্ষ্য করে দেখলে মোটেই তা মনে হয় না। তারা জীর্ণ-শীর্ণ ক্লান্ত, অসুস্থ গোছের চেহারা। মনে হয়, বুঝি এখনই পটল তুলে ফেলবে। কারুর বা একা আসবার ক্ষমতা নেই, সঙ্গে লোক, ধরে নিয়ে আসছে। সমস্ত বয়সের লোক,- ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, পুরুষ—সব।

তারা গুহার মত ঘরের পাশের বড় ঘরখানায় বসে। একে একে ডাক আসে। ওরা বসে থাকে আর ধোঁকে। তারপর হাতে একটা মোড়ক নিয়ে বার হয়। এক মাস, বড় জোর তিনমাসের মধ্যে ফিরে আসে।

অন্য চেহারা! বুড়ো অবশ্য 'যুবো' হয়নি, কিন্তু হয়েছে যেন কায়কল্প কারার ফলে অন্য লোক। লাঠি ভর দিয়ে যে বুড়ী এসেছিল, দিব্যি লাঠি ছেড়ে সোজা হয়ে এসেছে। অল্পবয়সী লোক হয়েছে তাগ্‌ড়া জোয়ান। আর তোমাদের মত ছেলেমেয়ে? গালে আপেল ধরেছে তাদের। পেড়ে খেলেই হয়।

তাহলে বেশ সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ইনি হচ্ছেন ডাক্তার, প্রকাণ্ড ডাক্তার।

এরা রোগী, ওষুধ নিয়ে যায়। একেবারে সেরে যায়, ফিরে আসে দেখাতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে।

কিন্তু যে স্কুল-ফাইনাল্‌টা পাশ করতে পারেনি, সে ডাক্তারী পড়বে কেমন করে?

পড়লই বা কবে? সারা দিনের মধ্যে কোন চর্চা নেই, কোনও ডাক্তারের সঙ্গে মুখচেনাও নেই।

বাড়ীতে ছেলেমেয়ের হাম জ্বর হ'ল, মাম্‌স্ হ'ল পাশের বাড়ীর ছোঁয়াচ লেগে।

এল প্রকাণ্ড ডাক্তার কল পেয়ে।

স্ত্রী তীর্থে গেল। ফিরে এসে হ'ল কলেরা, পথের খাবার খেয়ে।

এল শহরের সেরা ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তার আসে কমই ও বাড়ীতে। উড়োরোগের ছোঁয়াচ ও-বাড়ীতে কখনও-সখনও ভেসে এলেও রোগ নেই। স্বাস্থ্য সকলের দারুণ ভাল।

তবে ডাক্তার!

তিনি একটি মাত্র রোগের ওষুধ দেন। প্রথমে দেন একডোজ, ভাল হয়ে এলে আর একডোজ। প্রথমে টাকা দিতে হয় দর্শনী হিসাবে, দিব্যি মোটা টাকা এবং ওষুধের দাম। কন্‌ট্রাক্ট বেসিস্‌। সেরে গেলে দ্বিতীয় দফায় টাকা, যার কাছে যত পায়।

ওষুধের নামটি কেউ জানে না! গুহার মত ঘরের পাশে একটি আধুনিক ঝকঝকে ল্যাবরেটরি। সেখানে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে একা কি করে কে জানে! ঘরে কেউ ঢোকে না। চাকরবাকর পর্যন্ত না। সন্ধ্যা বেলায় সে নিজের হাতে ঝাঁটপাট দিয়ে রাখে।

এত বড়লোকের হাতে ঝাঁটা?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

তবে যদি কোনক্রমে ঘরখানায় উঁকি দিতে পরে দেখবে—কিছু নেই। এককোণে একটি লোহার সিন্ধুক মাত্র। ওপরে একটি বিকট কাঠের ছাঁচে তোলা মূর্তি বসানো। দেখতে মানুষের মত, কিন্তু মানুষ বলে মনে হয় না। তিনি ইষ্টদেবতা এক বুড়োর মূর্তি।

সেই সিন্ধুক থেকে বার হয় শিকড়। দু'ভাগ করা। একভাগ প্রথমে, দ্বিতীয় ভাগ শেষে।

এটাই ওষুধ। একটি মাত্র রোগের ওষুধ সে জানে। লিভার ভাল করার ওষুধ। আর লিভার তো সব—লাইফকে ধরে রাখে লিভার। তাই লিভার যাদের ভাল, তাদের কোন রোগই কাবু করতে পারে না।

ওর ওষুধে সারাজীবন লিভার ভাল থাকে।

অমন ওষুধটা শিখল কোথায়?

শিকড়-বাকড় যখন, তখন নিশ্চয় ওর মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছে .

উঁহু! ও নিজেই ছেলেবেলায় দারুণ লিভারের ব্যারামে ভুগতো। ওর বাবা-মা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। গরীবের ঘর, ওষুধ-পথ্য কোথায়? ডাক্তার দেখাবারও পয়সা নেই!

তবে?

সেই গল্পটি বলতেই এসেছি আজ।

তোমরা আমার সঙ্গে এস। চল কলকাতার কাছে একখানা পুরনো গাঁয়ে যাই। মার্টিনের ছোট ট্রেন ধরে হুস্‌হুস্ করে ছোট ছোট ষ্টেশন পেরিয়ে চল যাই।

গাছপালাঢাকা গ্রামটির একখানা কুঁড়ে ঘরে ওই লোকটিকে দেখা গেল। তখন বারো-চোদ্দ বয়সের ছেলে সে। মাটির দাওয়ায় বসে কাশছে। রোগা জিরজিরে মূর্তি, যেন কাঠি। খেতে পারে না, হজম হয় না। অবশ্য খাবার ঘরে নেই বেশী কিছু, পথ্যই যোগাড় হয় ন

ছেঁড়া কাপড়-পরা মা একখানা ভাঙা কুলোয় খুদ বাছছে। লোকের বাড়ী চেয়ে-চিন্তে চাল-ভাঙানী খুদ যোগাড় করেছে। এখানে রেঁধে দেবে ছেলেকে। ছেলে ভারী অসুস্থ। যত্ন-আত্তি করার শক্তি কোথায়! কি হয়েছে বুঝতে পারছে না কেউ। কেবল ভুগছে।

ছেঁড়া-ময়লা পিরাণ, তালি দেওয়া চটি পরা, বাবা এল। এই খর রোদে মাথায় একটা ছাতা নেই। সেরেস্তায় তিরিশটি টাকা মাত্তর পায়। দু'বেলা খাওয়া যোটে না। বাবা দাওয়ায় বসে গামছার বাতাস খেতে খেতে বলল, "ব্যবস্থা করে এলাম খোকাকে ডাক্তার দেখাবার।"

মা বলল, "শিবচরণ ঠিক করে দিল?"

শিবচরণ এদের বন্ধু, মুদী। দয়া করে ধারে চাল-ডাল দেয়।

"হ্যাঁ, কলকাতার ওই যে বড় ডাক্তার এখানে এসে বসেছেন ওই পোড়ো বাড়ীখানা কিনে। একদিক সারানো হয়েছে বাড়ীর মাত্র,

প্রকাণ্ড বাড়ী। আজ সন্ধ্যেয় ওঁর ওখানে যেতে হবে। একটা পয়সা লাগবে না।"

মা খুশী হয়ে বলল, "খুব নামডাক হয়েছে এরি মধ্যে। এবার খোকা আমার সেরে উঠবে। আহা, এতদিন ধরে একটা ভাল ডাক্তার দেখাতে পারিনি। কি যে হয়েছে বাছার! ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে।"

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ জমিদারের দারোয়ান ডাক দিয়ে গেল। জমিদারের বুড়ী মা-এর গণেশ পূজার সখ হয়েছে। ফর্দ ধরতে হবে।

বাড়ীর কাজের জন্যে মনিবের কাজে গাফিলতির সাধ্য নেই। অগত্যা বাবা ছেলেকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল কখন কোথায় যেতে হবে। ছেলে আগে যেয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসুক। বাবা কাল সকালে যেয়ে ভাল করে শুনে আসবে।

সন্ধ্যাবেলায় ঝোপে-ঢাকা পোড়ো বাড়ীখানার কাছে খোকা পায়ে-পায়ে এল।

পোড়ো বাড়ীখানার ভূতুড়ে নাম ছিল বিলক্ষণ। জমিদারদের এক খুড়োমশাই থাকতেন এখানে। ওর মৃত্যুর পর সকলে কিছুদিন ভয়-টয় পেয়ে বাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছিল। বনজঙ্গলের মধ্যে বনজঙ্গল-ঢাকা বাড়ীখানা পড়ে থাকত। কেউ কখনও যেত না। সারা বাড়ী ঝোপে-ঝাপে ভরা।

এর মধ্যে কলকাতার একজন বড় ডাক্তার শহরের হাসপাতাল থেকে রিটায়ার করে পাড়াগাঁয়ে বসবাস করতে এলেন। প্রকাণ্ড বাড়ীখানা জলের দরে পেয়ে তিনি ভাবলেন খুব জিতলাম। জমিদারেরা পোড়ো বাড়ী ঘাড় থেকে নামিয়ে ভাবলেন খুব জিতলাম।

খোকা আস্তে আস্তে বাড়ীখানার সামনে এল। বাবা বলেছেন দক্ষিণমুখো ফটক দিয়ে ঢুকতে। ওদিকটা সারানো হচ্ছে। বিরাট দোতলা বাড়ী: উত্তরমুখো ফটক ভাঙাচোরা অংশে পড়েছে। বাড়ীর সামনে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ছোটছেলে দুর্বল-শরীরে আসতে বেশ খানিকটা দেরি করে ফেলেছে। বাড়ীর সামনে নির্জন, সামনের

দিকে শীতের দিনে দরজা-জানালা বন্ধ। যেন চাপা রহস্যে থম্‌থমে। দক্ষিণ-উত্তর কোণটা ঠিক করার চেষ্টা করতেই একটা গলা শোনা গেল, "এই যে খোকা, এসো। শিবচরণ তোমার কথাই বলছিল।"

খোকা আশ্বস্ত হয়ে স্বরের লক্ষ্য ধরে এগিয়ে একদিকে দরজার কাছে হ্যারিকেন লণ্ঠন দেখতে পেল। ভদ্রলোক বালাপোষ মুড়ি দিয়ে আলো ধরে পথ দেখাচ্ছেন।

ছোট একটা ঘরে ফরাস পাতা। সেখানে বসলেন ভদ্রলোক। ওকে সম্মুখের বেঞ্চে বসালেন।

"ব্যারামটা লিভার, বুঝলে?"

"আপনি তো দেখলেন না।"

"ওহে, আমার দেখতে হয় না। আমি সমস্ত জানি। বড় কষ্ট পাচ্ছ। বাবা-মায়ের একই সন্তান তো। তুমি মরে গেলে ওরা সইতে পারবে না।"

"অ্যাঁ? আমি মরে যাব নাকি?" খোকা ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"মরার মধ্যে ভয় কি আছে! সবাই তো মরেই যায়। কিন্তু তোমাকে আমি ভাল করে দেব। একদম। জীবনে লিভার খারাপ হবে না। ওষুধটি দেখিয়ে দিচ্ছি; নিজের হাতে তুলে নেবে, এস।" খোকা অবাক হয়ে বলল, "আপনি কি কবিরাজ নাকি যে, গাছ-গাছড়ার ওষুধ দিচ্ছেন? কলকাতার ডাক্তারেরা তো কাঁচের শিশি ভ'রে মিক্‌স্‌চার দেন।"

"কলকাতার ডাক্তারেরা ছাই জানে।" ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, "জানো খোকা, দেশী গাছগাছড়ার কাছে বিলিতী ওষুধ লাগে না। আমি প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছি। এস।" তিনি মাথা-কান-ঢাকা বালাপোষ আরও গায়ে টেনে নিয়ে ওকে ডাকলেন।

খোকা ওঁর পেছনে বার হয়ে এল। সামনেই গাছ, ঝোপঝোপ। সারা জায়গা ছেয়ে আছে ওই একই গাছ। গাছের পাহাড়—গন্ধমাদন যেন।

“নাও তোল। শিকড়সুদ্ধ নাও। খালিপেটে সাতদিন সকালে রস করে খাও। ব্যস্, আর দেখতে হবে না।”

টিম্‌টিমে লণ্ঠনের আলোয় গাছটা তুলে নিয়ে খোকা বলল, “এগুলো ওষুধ নাকি, সারা বাড়ী ভরা? আমরা ভাবি আগাছা।”

“হুঁ, আগাছা! কত কষ্ট করে গাছগুলো লাগিয়েছিলাম।”

নিজের মনে বুড়ো ভদ্রলোক বলে চললেন, “কেউ জানল না, কি অমূল্য রত্ন রয়েছে এখানে। গুরুর কাছে দৈব ওষুধ পেয়েছিলাম। পরখ করে লোককে দেখাবার সময় পেলাম না।”

খোকা কেমন চমকে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে বুড়ো বললেন, “কলকাতার ডাক্তার! ডাক্তার! ডাক্তার! হুঁ! যদি জানত এই বাড়ীতে এখানে কি আছে, বড়লোক হয়ে যেত!”

খোকার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। “আপনি কি কলকাতার ডাক্তার নন?” চিৎকার করে উঠল সে।

“আমার দায় পড়েছে কলকাতার ডাক্তার হতে। কিন্তু ছোকরা এমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন? এক্ষুনি লোক জমে যাবে যে। চললাম।”

ভদ্রলোক ধোঁয়া হয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন। আর খোকা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু ওর চিৎকার শুনে তক্ষুণি দক্ষিণ দিকের অংশ থেকে কলকাতার ডাক্তারবাবুরা এসে গেছেন। খোকা ভুল করে উত্তর দিকে গিয়েছিল। সেখানে জমিদারদের খুড়োমশাই থাকতেন।

তারপরে?

তারপরে যা দেখতেই পাচ্ছো আজ। খোকা যত ছোটই হোক, লেখাপড়া না-ই করুক, শিকড়ের কথা কাউকে বলেনি।

সেই শিকড় আজ তার সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। একবার খেলেই কাজ হয়, কিন্তু লোকজনকে হাতে আনতে হু'বার ব্যবস্থা করেছে সে মাথা খাটিয়ে।

বিশ্বাস না হয় দেখগে যাও। লিভার খারাপ থাকলে এক্ষুণি যাও, ছুটে যাও॥

শুক্কু

—শম্ভু ঘোষাল
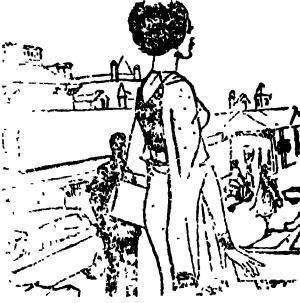
শুক্কু বাবা, একটু চুপ কর হরলিকস্‌টা নিয়ে আসছি। শুক্কুর মা ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। গ্যাস উনুনটায় দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি দেবার আগে গন্ধ শুঁকে নেওয়া শুক্কুর মার স্বভাব। কাগজে পড়ছেন আক্‌চারই কতো মানুষ গ্যাস উনুন জ্বালাতে মারা গেছে!

—মা, তোমার পায়ে পড়ি আমি হরলিকস্‌ খাব না। আমি তো ভালো হয়ে গেছি। আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো—ছোট্ট শুক্কু। তোমাদের মতোই বাচ্চা। কতো আর বয়স ছয়-সাত। ডানলপ্‌-পিলোর গদির বিছানায় পাশ ফিরলো। মার পাশেই সে শোয়। কিন্তু অনেক দিন অসুখে ভুগেছে বলে তোকে ছোট একটা ডানলপ্‌-গদি খাটের ওপরই পেতে দেওয়া হয়েছে। জমানো নরম পুরো রবারের গদি। দেহটা যেন ডুবে যায়!

—দুষ্টুমি করোনা বাবা সোনা। তুমি তো ভালো হয়ে গেছ! নিশ্চয়ই ভালো হয়ে গেছো। আমি হরলিকস্‌ করছি খাও, দেখবে কালকেই তুমি তোমার বন্ধুদের সংগে খেলতে পারবে!—না মা আমি খাবো না। আমি বাবার কাছে যাবো। শুক্কুর মা—এই যা! তোমাদের ওঁর নামটাই বলা হয়নি। ভাস্বতী দেবী। গ্যাস উনুনের চাবিটা ঘুরিয়ে দিলেন। বল্লেন—তোমার জন্য কতো খেলনা নিয়ে আসবে তোমার বাবা। পাশ ফিরে শুলো শুক্কু। রোগা—ভীষণ রোগা। চাদর ঢেকে শুয়ে আছে ছেলেটা। কিন্তু মনে হচ্ছে চাদরের তলায় কয়েকটা পাট-কাঠি রেখেছে কেউ।

—তুমি বলেছ বাবা তারাদের কাছ থেকে আজ আমার সংগে দেখা করতে আসবে। যদি না আসে আজ আমি আর কোনোদিন হরলিকস্‌ খাবো না। না কোনোদিন না—। গ্যাস উনুনের চাবি খুলে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভাস্বতী দেবী। কতোদিন হবে প্রায় ছয় বছর হলো শুক্কুর বাবা হারিয়ে গেছেন! বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতীয়

সেপাই মেজর দে সেই যে গেলেন আর ফিরে এলেন না। অদ্ভূৎ এক পরিস্থিতি। মানুষের শেষ পরিণতি মৃত্যু। সেটা যদি জানতেন তবু ছেলেকে না হয় ঘুরিয়ে বলা যেতো কিছু। কিন্তু ফৌজী দপ্তর কয়েক বছর ধরেই অনুসন্ধান করতে গেলেই জানাতো 'মিসিং' অর্থাৎ হারিয়ে গেছে।

বাপ-অন্ত প্রাণ ছেলের। বাবা কোথায়? বাবা কোথায়? বাবাকে এনে দাও—তবে আমি খাবো।

শুক্কুর বন্ধুরা ঠাট্টা করে—যা যা, ভাগ! অই-অই তোর বাবা তো তালপাতার সেপাই! যুদ্ধ করতে করতেই হাওয়ায় উড়ে গেছে। অই-অই!

যতো ঝাল এসে মার ওপর ঝারে ছেলে। খেলনা ভাংগে। কাপ ডিশ আছাড় মারে।

সেই শুক্কুর বাবার খবর পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় পাবনা সীমান্তে মেজর দে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু কী করে ছেলেকে জানাবেন সে কথা। এতো দিন শুধু বলে এসেছেন—তোমার বাবা, ওই যে আকাশে অনেক তারা দেখছো। ওই একটা তারায় গেছেন। তোমার জন্য অনেক খেলনা নিয়ে আসবেন। কিন্তু আজ! টপ্-টপ্ করে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো ভাস্বতী দেবীর চোখ থেকে। চোখের জলটা মুছবারো সময় পেলেন না। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন পাশের ফ্ল্যাটের রেখা দেবী। একজন বিখ্যাত লেখকের বিধবা। হাউমাউ করে কথা বলেন।—ঠিক যেন তাড়কা রাক্ষুসী। শুক্কু ওকে দেখলেই বলবে। না না ওনার ছেলে শুক্কুর খেলা ভেংগে দেয়নি। ওনার ছেলেপিলেই নেই।

—ছিঃ দিদি আজকের দিনে কাঁদতে আছে! আজ আপনার মতো ভাগ্য কার? স্বয়ং ভারতের প্রধান সেনাপতি আপনাকে উপহার দেবেন। এই তো সুন্দর লাগছে। কাপড়টা বদলাবেন চলুন। আরে চলুন, শিগগীর চলুন!

—কিন্তু শুক্কুকে একা ফেলে যাই কী করে? যা রোগে ভুগেছে! হিড় হিড় করে ভদ্রমহিলা ভাস্বতী দেবীকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন নিজের ফ্ল্যাটে। বল্লেন,—ভয় কী আমি দেখবো। আপনার চাকর মদনকে নিজে সব দেখে শুনে শুক্কুর পথ্য করতে বলবো। একটা সুন্দর বাঁশীর আওয়াজ তুলে প্রধান সেনাপতির নিজস্ব বিরাট গাড়ীটা

শুক্কুদের চোদ্দ-তলা বাড়ীটার একদম শুক্কুর জানলার পাশেই থেমে গেলো। হ্যাঁ শুক্কুরা একদম নিচের তলায় থাকে। ইংরাজীতে যাকে বলে গ্রাউণ্ড ফ্লোর। ঐ বিরাট গাড়ীটার আগে পিছে অনেক গাড়ী এসে জমলো। তর্‌তর্‌ করে জনা দশেক অফিসার—জোয়ান ফ্লাট্‌-বাড়ীতে ঢুকলো সংগে সংগেই।

সৈন্যদের সংগে গাড়ীতে উঠবার আগে শুক্কুর ঘরে ঢুকলেন ভাস্বতী দেবী। কপালে চুমুও দিলেন। কিন্তু ছেলের ঘুম ভাংগলো না। তিনিও রুগ্ন ছেলেকে আর জাগালেন না। ভাস্বতী দেবী কিন্তু গ্যাস উনানের গ্যাস এই তাড়াহুড়াতে বন্ধ করতে ভুলে গেলেন।

গাড়ীগুলি শুক্কুদের পাড়া থেকে বেরোতে না বেরোতে মুষল-ধারে বৃষ্টি নামলো। মনে হচ্ছে আকাশ থেকে সাদা চাদরের পর চাদর কে যেন ফেলে যাচ্ছে।

রাত আটটায় মদনের আসবার কথা। কিন্তু এলো প্রায় নটায়। সিনেমা থেকে বেরিয়ে সে কিছুটা অপেক্ষা করলো। যদি বৃষ্টি থামে। না থামলো না বৃষ্টি। হাটা দিলো সে। একসময় সৈনিক ছিলো। নেশা করতে শিখেছিলো তখনই চারদিক অন্ধকার। হোঁচট খেতে খেতে আর হাতড়াতে হাতড়াতে কোনো রকমে সে ফ্ল্যাটটায় ঢুকলো। শুক্কুদের বাড়ীতে কাজ করে সে। ফ্ল্যাটের একটা চাবি সব সময় থাকে তার কাছে। ফ্ল্যাটে ঢুকে আন্দাজে ড্রেসিং টেবিলটা থেকে টর্চ তুলে নিয়ে জ্বালালো। দেখলো শুক্কু ঘুমুচ্ছে। ফ্ল্যাটে জল তার কোমরের কাছে। শুক্কুর খাট প্রায় ছুঁই ছুঁই। বৌদি বলেছেন আট-টায় শুক্কুকে মাংসের স্ট্রু দিতে। প্রায় নটা বাজে। বৌদি ভীষণ চটে যাবে। আগে ষ্টু-টা তৈরী করি তারপর ওপরে যেখানে মাল পত্তর রাখবার তাক আছে সেখানে তুলবো। একটা খারাপ কথা বল্লো মদন,—বৃষ্টি, খালি বৃষ্টি। বৃষ্টি দেখাবার জায়গা পায়নিকো। রান্নাঘরে ঢুকতে থমকে দাঁড়ালো সে। কী রকম একটা গন্ধ না! তাক থেকে দেশলাই নিলো। অন্যমনস্কভাবে ধরাতে গেল গ্যাস উনুন। ভীষণ শব্দ আর আগুনে সমস্ত ঘরটা যেন ভেংগে পড়লো।

বাইরের ঝড় জল বৃষ্টি! কোলকাতার বুকে একশো বছরের মধ্যে এতো বড় বৃষ্টি আর কখনো হয়নি। কিন্তু শুক্কু কোথায়, সে তখন তারাদের রাজ্যে! ফুল পাখী আর গান! কল কল করে ছোট নদী বয়ে

চলেছে। গাছে সুন্দর সুন্দর ফল যা সে ভালোবাসে। আপেল, আংগুর, নেস্‌পাতি বেদানা। খুব ইচ্ছে হলো তার খেতে। কিন্তু কাকে চাইবে? না বলে সে ফল ছুঁতে পারবে না। কক্‌খনই না!

কিন্তু ও-কী! এতো শব্দ কীসের। মনে হলো হাওড়া ষ্টেশনে যেন একসংগে একশোটা ইলেকট্রিক ইনজিন সিটি বাজালো, আর সূর্যটা বড় হতে হতে তার চোখের সামনে এগিয়ে আসছে। উঃ গরম! অসহ্য গরম! আর পারি না। আমি মরে যাবো, মরে যাবো!—বাবা, বাবাগো!!

—ভয় কী বাবা, আমি তো তোমাকে কোলে নিয়েই আছি। আঁৎকে উঠে শুকু দেখে সে বাবার দুটো হাতের মধ্যে শুয়ে। বাবার পরণে আছে সেই মিলিটারী পোষাক যে পোষাকে ছোট শুকু অনেক—অনেক বছর আগে দেখেছিলো!

—শুকু। আমার সোনার শুকু, কতো বড় হয়ে গেছে! বিশ্বাস হয় না শুকুর। তার বাবা তো তারাদের রাজ্যে। এলো কী করে?

—বাবা, তুমি এলে কী করে?

—কেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে!

ভীষণ চমকে ওঠে শুকু। বাবার মুখের একপাশে একটা হা-করা গর্ত। আর সেখান দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

—বাবা, তোমার মুখে কী হয়েছে? অতো রক্ত কেন?

—বোকা ছেলে! সব ভুলে যায়। আমি যে যুদ্ধে গিয়েছিলাম! শুকুদের পাড়ায় জল অনেকক্ষণ হলো নেমে গেছে।

ছোটো খাটো একটা যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে ভাস্বতী দেবী যখন তার ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন তখন প্রায় রাত একটা! মেডেল টাকা আর মেজর দে-র ব্যবহার-করা জিনিষপত্র বুঝে নিতে বেশ সময় গেছে। তারপর খানাপিনা। অফিসার-রাও বেশ কিছু দেরী করে দিয়েছেন। সকলেই ভেবেছেন বৃষ্টিটা এই থামবে, কিন্তু না বৃষ্টি থামেনি। সমস্ত কোলকাতাই বরংচ সেই বৃষ্টির তোড়ে ভেসে গেল একসময়!

নিজের ফ্লাট-টাই যেন চিনতে পারছেন না ভাস্বতী দেবী। রাজ্যের পুলিশ, দমকল আর দিশেহারা লোকের জটলা। মিলিটারী যুদ্ধের গাড়ী থামতেই নষ্ট হওয়া রেডিওর আজে বাজে আওয়াজ কে যেন চাবি এঁটে বন্ধ করে দিলো। মাথা নীচু করে দাঁড়ালো মানুষ।

—কী হয়েছে ?

কতো মিলিটারী গাড়ী আর সবচেয়ে যেটা সুন্দর তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এলেন ভাস্বতী দেবী। ঘাবড়ে গেছে অনেকেই। একজন সাহসী লোক এগিয়ে এসে ব্যাপারটা জানালো—আপনার ফ্লাটে আগুন লেগেছিলো। মদন—আপনাদের বাড়ীতে যে কাজ করে—শোনবার জন্য দাড়ালেন না ভাস্বতী দেবী।

—শুক্কু ! আমার ছেলে—

বুকের ধড়পড়ানিটা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। মুখটা যেন দশ দিনের উপোসীর মতো। শক্ত কাঠ। গলার আওয়াজও বেরোতে চায় না। পড়ি মড়ি করে ছুটে গেলেন শুক্কুর ঘরে। না, কোথাও নেই শুক্কু !

—শুক্কু !!

সব ভদ্রতা, আদব কায়দা গ্রামের একটা মুখ্‌খু-বৌয়ের মতোই ভুলে গেলেন তিনি। চিৎকার করে উঠলেন বুক ফাটা একটা আর্তনাদে। না, ঘরের কোথাও শুক্কু নেই !—শুক্কু !!

—ওই, ওই তো ওপরের সিমেণ্টের তাকে ডানলপ-পিলোর ওপর শুয়ে বিড় বিড় করে কী বলছে !

হাসিতে-কান্নাতে যেন পাগল হয়ে গেলেন ভাস্বতী দেবী।

—রাক্ষসী !

চমকে উঠলেন সকলে। যে শুক্কু আজ পাঁচদিন হলো মাথা তুলতে পারে না সেই শুক্কু বিছানায় উঠে বসেছে। মাকে ধমকাচ্ছে। অত উঁচু তাকে উঠে গেছে !

—ধন্যি মা বটে আপনি !

কখন যেন পাশের ফ্লাটের সেই রেখা দেবী ঘরে ঢুকেছেন। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

—চুপ করো তোমরা !

— দেখছো না, আমি বাবার সংগে কথা বলছি !

—কার সংগে কথা বলছিস তুই ! বাবার সংগে ! তুই ওই ওপরে উঠলি কী করে ?

—বাবাই আমাকে কোলে করে তুলেছে।

বিশ্বাস হয় না কারোর। পাশের পাড়া থেকে আগুন লাগার

খবরে ভাস্বতী দেবীর ছোটো তিন ভায়েরাও ছুটে এসেছে। হতভম্ব সব। বড়মামা ঘর-সংসারী। সেই জিজ্ঞাসা করে, —তোর বাবা! বিরক্ত হয় শুক্কু। জোর দিয়ে বলে, —হ্যাঁ, তো। এই তো বাবা আমার পাশে। বাবা—

ছায়া সরে গেছে। আঁকু-পাঁকু করে শক্কু চারদিকে তাকায়। ঘরের প্রতিটি মানুষকে খুটিয়ে দেখে, বাবা কোথাও লুকিয়ে আছে। না, তার বাবা নেই! এতোগুলি মানুষ থাকতেও ঘর তার শূন্য! কান্নায় ভেংগে পড়ে ছোট্ট শুক্কু।

—তোমরাই আমার বাবাকে লুকিয়ে রেখেছো। ভূত-পেত্নি, অশরীরী আত্মা, আগডম-বাগডম অনেক কিছুই বিশ্বাস করেন শুক্কুর মেজো মামা। শুক্কুর কান্না থামতেই তিনি বল্লেন, —বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না অর্থাৎ তেনাদের মানে তোমরা যাদের অসভ্য ভাষায় ভূত-পেত্নি বলো, তারা সময় সময় আজো মানুষের উপকার করে। না হলে ভেবে দেখো—যে তাকে উঠতে মই লাগে সেই উঁচু তাকটায় ওই বাচ্চা ছেলেটা উঠলো কী করে!

ছোটো মামা তিনি থিয়েটার পাগল লোক। থিয়েটারী ভংগীতে তিনি বলে উঠলেন,—সব ব্যাপারটাই হচ্ছে ইল্যুউশন। বাংলায় বোধহয় বলে মায়া-মরীচিকা! বিশ্বাস, বিশ্বাস চাই! যীশুর সেই গল্পটামনে আছে—একজন মানুষ। সে বিশ্বাস করতো জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে। তর্ তর্ করে সে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতো। আমাদের ছোট্ট শুক্কুও পট পট করে খাড়া দেওয়াল দিয়ে তাকে উঠে গেছে। দেখো, কী শেয়ানা ছেলে, যাবার সময় আবার আরাম করে ঘুমাবার জন্য গদিটাও নিয়ে গেছে।

শুক্কুদের পাড়াটা খুবই নীচু। একটুকু জল হলেই আশে পাশের জলও জমা হয়। বড় বড় বাড়ী হয়েছে ঠিক, কিন্তু বাড়ীগুলি তৈরীর সময় জমি উঁচু করার কথা কর্তারা বোধহয় ভুলে গেছিলো। ভরসা এই বেশী জল জমলে পাম্প দিয়ে জল বার করবার ব্যবস্থা আছে।

শুক্কুদের ঘরের জল কমতে কমতে প্রায় পায়ের গোড়ালিতে এসে ঠেকেছে। বড় মামার পায়ের গোড়ালির নীচে কী একটা ঠাণ্ডা মতো জিনিষ এসে লাগলো। ভদ্রলোক খচ্‌মচ্‌ করে একটা তুড়িলাফ দিয়ে উঠলেন সাপ ভেবে। কিন্তু সামলাতে পারলেন না। ধপাস্‌ করে

জলে উল্টে পড়লেন। যে জিনিষটার জন্য তার এই কেলেংকারী অবস্থা অাঁকপাঁক করে তুল্লো একটি জোয়ান। দেখা গেলো টর্চের আলোয় সেটা শুকুরই একটা রবারের বল। বড় মামার অবস্থা দেখে শুকু কান্না টান্না সব ভুলে খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলো।

ভ্রুক্ষেপ নেই বড় মামার। টর্চের আলোয় গম্ভীর ভাবে বলটা দেখতে দেখতে মাথা নাড়লেন তিনি—খুঁটিয়ে দেখলেন ঘরটা। বল্লেন, —দি আইডিয়া। ফাঁপা রবার জলে ভাসে। ডানলপ-পিলোয় গদিও ফাঁপা রবার। তার মানে দাঁড়ালো,—জল ওই তাক্ তক্ উঠেছিলো। শুকুও জলের সংগে ওই উঠেছিলো তাক পর্যন্ত। কিন্তু জল নেবে এসেছে। কিন্তু ওই বিচ্চু ওখানে চেপে বসে আছে। অর্থাৎ জল যখন নামতে আরম্ভ করে ব্যাটা তখন তাকের ওপর ডানলপ-পিলোর গদীতে শুয়ে।

একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন ভীর ঠেলে। সায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কী করে বুঝলেন?

পুলিশ অফিসার তাকে তারিফ করছে। গ্যাস খায় বড় মামা, বুঝিয়ে বলছি। টর্চের আলো ফেলুন। কী দেখছেন? তাকের ওপর পর্যন্ত দেওয়ালটা ভিজে না? আচ্ছা, তাতেও যদি সন্দেহ থাকে, দেখুন ঘরের ওই কোনটায়। কী দেখলেন। ভিজে জায়গায় একটা কেঁচো। কেঁচোটা এলো কোত্থেকে? পরিষ্কার—

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় পুলিশ অফিসার। টুপি পরায়—পুলিশে চাকরী করলে আপনি বিরাট অফিসার হতে পারতেন। ভালো কথা এই ঠাণ্ডায় যেন সব জমে যাচ্ছে। এক কাপ চা হলে হতো না।

ভীষণ লজ্জা পান ভাস্বতী দেবী,—সত্যি তো আমার খেয়াল হয়নি। মদন, এই মদন!

মাথা নীচু করে পুলিশ অফিসার। মদন আর কোনোদিন আপনাদের চা করবে না।

—মানে।

—জিজ্ঞাসায় একসংগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরের সকলে!

—আপনাদেরই রান্নাঘরে গ্যাস উনুন বার্ষ্ট করায় মারা গেছে মদন!

—*—